লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বারুণীর মেলা।

রায়পুরের বারুণীর মেলা বড় প্রসিদ্ধ। এই মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক দূর-দূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। দোকানী পসারী যে কত আসে, তাহার সংখ্যা হয় না। যদিও স্নান উপলক্ষে মাত্র মেলা, তথাপি স্নানের সাত-আট দিন পূর্ব্ব হইতেই জনতা আরম্ভ হয় এবং স্নানের তিন চারি দিন পর পর্য্যন্ত মেলা থাকে। রায়পুরের গৃহস্থদের আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে থাকে, এই উপলক্ষে রায়পুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ছাড়া অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতিতেও রায়পুরের ঘরে ঘরে লোক ধরে না।

আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরে বারুণীতে একটী যোগ ছিল বলিয়া জনতা কিছু বেশী হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসরে স্নানের দিন যত লোক না হয়, এবার মেলার তিন-চারি দিন আগেই তাহার অধিক লোক হইয়াছিল। যাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে রোগ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া জনস্রোত কমে নাই। যাত্রীরা আসিয়াই তেলেভাজা বেগুনি, ফুলরী, পাঁপড়ভাজা, মুড়ি ও কড়াইভাজার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আর রৌদ্রে ঘুরিয়া এঁদো পচা পুকুরের জল অঁাজলা ভরিয়া পান করিতেছিলেন; সুতরাং রোগের কোন দোষ ছিল না। তা হইলে কি হয়, মেলা-দেখা রোগটা অন্য বৎসরের অপেক্ষা অধিক সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের বৌ, স্বামীর উপর অভিমান করিতে-ছিলেন, তিনি কেন শাশুড়ীর সঙ্গে তাহাকে মেলায় যাইতে দিলেন না। ম্যালেরিয়ার প্রিয় শিষ্য, ছোট একটী শিশু তাহার মার সঙ্গে মেলা দেখিতে যাইবার জন্য আব্দার করিতেছিল; মা কিন্তু ননদের কাছে ছেলেটী রাখিয়া মেলা দেখিতে প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পুলিসঘাটি বসিয়াছিল, যাত্রীরা মেলা হইতে এক ক্রোশ দূরে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও তাহাদের কাছে অপরাধী হইতেছিলেন; তবে দুই চারি আনা পয়সা দিয়া মেলার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও স্বতন্ত্র কথা।

রাজগ্রামের হেমন্তকুমারের মাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী লীলাকে লইয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে বলা কহা ছিল বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের কুটুম্ব রায়পুরের গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

গত বৎসর লীলার অমূল্যকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু লীলা এ অবধি বাপের বাড়ীই ছিলেন। লীলা তাহার ঠাকুর-মার বড় আদরের। আর দুই দিন পরে লীলা শ্বশুর-বাড়ী গেলে তাহাকে আর দেখিতে পাইব না ভাবিয়া, লীলা আজ-কাল যে আব্দার করিত, ঠাকুর-মা প্রায় তাহা শুনিতেন; আজও সেই আব্দার অনুসারে লীলাকে তাহার ঠাকুর-মা মেলা দেখিতে আনিয়াছিলেন।

সেদিন হেমন্তকুমারের মাতা মেলা দেখিয়া, রৌদ্রে ঘুরিয়া, রাশীকৃত খেলনা—হাঁড়ী, পুতুল, ধুচনী, চুবড়ী কিনিয়া, ক্লান্ত হইয়া সবে মাত্র গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় রামনগরের তালুকদার নীলরতন রায় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ ঘোষ দূর-সম্পর্কে নীল-রতনের জ্ঞাতিকুটুম্ব। অন্য কোন বিষয়ে সম্পর্ক না থাকিলেও নীলরতন মেলার সময় আসিয়া দুই চারি দিন গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী কাটাইয়া যাইতেন ও গোবিন্দ ঘোষকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করিতেন না।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও নীলরতন আসিলে, তাঁহার সমাদরের ধূম পড়িয়া গেল। গোবিন্দ ঘোষ আসিয়া তাড়াতাড়ি "কেমন আছেন?" "বাড়ীর সব কেমন আছে?" "কখন বাহির হইয়াছেন?" "পথে আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত?" ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। নীলরতনও সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ত্রুটি করিলেন না, তবে মাঝে মাঝে লীলার দিকে চাহিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন। তা গোবিন্দ ঘোষ অতটা যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। এই

খানে বলিয়া রাখা ভাল, গোবিন্দ ঘোষ নিতান্ত নির্দ্ধন ছিলেন না। তবে নীলরতন রায়ের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার অবস্থা অবশ্য অনেক হীন ছিল। তা নীলরতনের ধন আছে বলিয়াই হউক বা তাঁহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই হউক, গোবিন্দ ঘোষ নীলরতনকে যেন একটু ভয়প্রযুক্ত বিশেষ অভ্যর্থনা করিতেন।

নীলরতন বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার ষোল আনা সক্ ছিল। পরণে কালাপেড়ে ধুতি, গলায় কোঁচান চাদর, হাতে রূপা-বাঁধান ছড়ি, পায়ে বার্ণিস জুতা। বয়সকে ফাঁকি দিবার জন্য চুলে কলপ লাগাইয়া ছিলেন; তবে কথা কহিবার সময় দাঁতের মাঝে মাঝে দু-একটা ফাঁক দেখা যাইত। তখন "কৃত্রিম দন্তের অভাবনীয় কাণ্ড হয় নাই"—আর মদন সেকরা দাঁত বাঁধাইবার সময় একটা শক্ত দাঁত খারাপ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া, নীলরতনবাবু দাঁতের দিকে আর বড় একটা নজর দেন নাই। অনেক ঝামা ও সাবান খরচ করিয়া, নীলরতন তাঁহার কৃষ্ণকান্তি করসা করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার কাল রংএর উপর চাক্‌চিক্য ছিল। যাহাই হউক, নীলরতন আপনাকে এখনও যুবা মনে করিতেন। আর বয়সে তাঁহার যাহাই করুক না কেন, আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার বিলক্ষণ শক্তি-সামর্থ্য ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীলরতনের পূরা সক্ ছিল। যেখানে যাত্রা, বারোয়ারি, খেম্‌টা, গান, কবি কি মেলা হইত, সেই-খানেই নীলরতনের দেখা পাওয়া যাইত। বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকের বেশী সমাগম, সেইখানে নীলরতন ঝড়ের আগে এঁটো-পাতের ন্যায় দেখা দিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্থান-

অস্থান, মান-মর্য্যাদা কিছুই জ্ঞান ছিল না। সামান্য লোকের নিকট যাইতেন বলিয়া, যদি এই সব বিষয়ে কেহ কিছু বলিত, তবে ইদানীং তিনি উত্তর দিতেন, "আর কয়টা দিনই বা আছি; সময় ত হ'য়ে এল, দেখিয়া লইতে দোষ কি?', তবে অন্য লোকের দেখা আর তাঁহার দেখায় কিছু ইতর-বিশেষ ছিল। তাঁহার দেখিবার সময়, তাঁহার চক্ষের উপর আর কাহারও চক্ষু পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি অনেক সময় মনে মনে নীলরতনকে যমের বাড়ী পাঠাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেন। তবে দু-একটা লোক যে নিতান্ত ফিরিয়া চাহিত না, তা একেবারে বলিতে পারি না।

নীলরতনের অনেক কু-মন্ত্রী ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার লাঠিয়াল, সড়কী পাইকগণ একবার হুকুম পাইলে লুঠ-তরাজ করিতে—ঘর পোড়াইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। তারপর ফৌজদারী মাম্‌লা হইলে, সাক্ষী তৈয়ার করিতে—জাল সাজাইতে, মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে নীলরতন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রমাণের নড়্‌চড় ছিল না। হাকিম কি ভাবিয়া তাহার সাক্ষীদের অবিশ্বাস করিবেন, খুঁজিয়া পাইতেন না; পুলিস, নীলরতন ও তাঁহার অনুচরগণকে আসামী করিতে ভয় করিতেন। নীলরতনের ভয়ে চারিদিকের লোক সশঙ্কিত থাকিত। গোবিন্দ ঘোষ যে ভয়ে তাঁহার সমাদর করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

দু-এক কথার পর, নীলরতন লীলাকে লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে?"

লীলা তখন তাহার আকুঞ্চিত কেশদাম দোলাইয়া, তাহার বৈশাখ চম্পক কান্তি লইয়া, রৌদ্রভ্রমণজনিত আরক্তিম গণ্ড-স্থলের অধিকতর আরক্তিম প্রভা বিস্তার করিয়া, চঞ্চল চক্ষের চাহনি চাহিয়া, নীলরতনকে মুগ্ধ করিয়া, ঠাকুর-মার সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর অন্দরে চলিয়া যাইতেছিলেন। মুগ্ধ করিয়াই ত! লীলাকে দেখিয়া শক্র ফিরে চায়! নীলরতন কোন্ ছার! নীলরতন অনেক দেখিয়াছেন, এমন রূপের সমন্বয় ত দেখেন নাই! মরি মরি! বিধাতা না জানি কি উপকরণ লইয়া এই রূপ-প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াছেন! প্রস্ফুটিত গোলাপে এমন শোভা নাই, ভাস্করগঠিত দেব-প্রতিমায় এমন সৌন্দর্য্য নাই, অবিচল সৌদামিনীতেও বুঝি আভা নাই!

লীলা ত চলিয়া যাইতেছিলেন,—নীলরতনের রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা শুনিয়া, মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; সেই সময় তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। লীলা তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি দিয়া কেশ-গুলি সরাইয়া দিলেন। পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণজ্যোতি নীলরতনের মুখে আসিয়া পড়িল। নীলরতনের মাথা ঘুরিয়া গেল।

মিত্তির একদৃষ্টে কি দেখিতেছে দেখিয়া, ঠাকুর-মা বলিলেন, “চল মা চল।”

এই অবসরে গোবিন্দ ঘোষ লীলার কি পরিচয় দিবেন, ভাবিয়া লইতেছিলেন। সত্য পরিচয় দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তবে মিথ্যা বলিলে কি জানি, যদি নীলরতন পরে সত্য কথা কোন রকমে টের পান, তাহা হইলে আপনাকে বিপদে পড়িতে হইবে, এই ভাবিয়া মিথ্যা

বলিতেও সাহস কুলাইতেছিল না। আর নীলরতন যে রকমের লোক, এখনি পিছনে লোক লাগাইয়া সব ঠিকানা জানিতে পারিবেন। কাজেই সাত-পাঁচ ভাবিয়া নীলরতন সত্য পরিচয় দিবেন ঠিক করিলেন।

তখন গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "এঁরা আমার দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব; মেলা দেখিতে আসিয়াছেন।"

নীতরতন হাস্য করিয়া বলিলেন, "আরে ভায়া, তা ত বোঝা গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এটি কার মেয়ে?"

নীলরতনের হাস্য ঠাকুর-মার মনে কেমন লাগিল।

গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "ইনি রাজগ্রামের হেমন্ত-কুমারের মেয়ে।"

নীলরতন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী দেখ্‌ছি বিবাহিতা। উহাঁর কোথায় বিবাহ হইয়াছে? সঙ্গের স্ত্রীলোকটীই বা কে? উনি কি একেলা মেলা দেখিতে আসিয়াছেন?"

গোবিন্দ ঘোষ সব জানিতেন; কিন্তু জানিয়াও উত্তর দিলেন না। বলিলেন, "আমি সব ঠিক জানি না।" এই সময় ঠাকুর-মা লীলার হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। নীলরতন গোবিন্দ ঘোষের দিকে একবার কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেন। গোবিন্দ ঘোষ সসম্ভ্রমে "আসুন, মুখ হাত ধুইবেন, আসুন" বলিয়া হাত ধরিয়া নীলরতনকে ঘরে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লীলার আব্দার।

বৈকাল বেলায় লীলার ঠাকুর-মা গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে তাঁহার ক্রীত জিনিসগুলি দেখাইতেছিলেন, আর বেশী ভারি বলিয়া আর তিনটী আহ্লাদে পুঁতুল আর এক বোঝা রং-করা হাঁড়ি আনিতে পারেন নাই বলিয়া, দুঃখ করিতে-ছিলেন। সেই সকল হাঁড়ির বিচিত্র রংএর ব্যাখ্যা করিতে-ছিলেন, এমন সময় গোবিন্দ ঘোষ আসিয়া ইঙ্গিতে তাহার স্ত্রীকে ডাকিলেন। তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া যাইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলার ঠাকুর-মা কি আবার আজ মেলা দেখিতে যাইবেন ?"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী বলিলেন, "ওমা, সেকি গো! এইমাত্র উনি পুঁতুল ও হাঁড়ি আনিতে পান নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন! বোধ হয়, আবার এখনি গিয়া সেই সব কিনিয়া আনিবেন।"

গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "না, আর মেলায় যাইয়া কাজ নাই।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী "তা ব'লব অথন" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী কথাটা তত গুরুতর বলিয়া মনে করেন নাই, তাই আবার ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, কথাটায় তত কাণ দাও নাই, কিন্তু তত উপহাসের কথা নহে। যদি নিতান্ত লীলার ঠাকুর-মা আবার মেলা দেখিতে যান, তবে লীলাকে যেন সঙ্গে লইয়া না যান। লীলা সুন্দরী মেয়ে; এরূপ. গোলযোগের স্থানে রূপের শত্রু অনেক।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তখন কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন। বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তা আগে হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। কুটুম্বের মেয়ে, দু'দিনের তরে আসিয়াছে বই ত নয়, শেষে কি একটা গোলযোগ বাধাইয়া বসিবে?"

তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী লীলার ঠাকুর-মাকে বলিলেন, "উনি বলিতেছিলেন, লীলাকে আর মেলা দেখিতে লইয়া যাইও না, লীলার সোমত্ত বয়স, কি জানি কার মনে কি আছে?"

ঠাকুর-মা চমকিয়া উঠিলেন। ষাট! ষাট! লীলা ত সেদিনকার মেয়ে, এর মধ্যে 'সোমত্ত' হইয়া উঠিল! ঠাকুর-মার কাছে তাঁহার আদরের লীলা তেমনটিই আছে, তা আমরা কি করিব? লোকে কিন্তু ইহার মধ্যেই লীলার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু তা হইলেই বা কি? লীলা যে কতগুলি হাঁড়ি, কতগুলি খেলনা, কতগুলি পুঁতুল

বাছিয়া রাখিয়া আসিয়াছে;—লীলা না যাইলে ত সেগুলি ঠাকুর-মা ঠিক করিয়া বাছিয়া উঠিতে পারিবেন না! এমন অবস্থায় ঠাকুর-মা লীলাকে না লইয়া যান কেমন করিয়া? ঠাকুর-মা বিব্রতে পড়িলেন।

এমনি সময় লীলা আসিয়া ঠাকুর-মাকে টানাটানি আরম্ভ করিল, "চল না ঠাকুর-মা! রৌদ্র পড়িয়াছে, আমার সব পুঁতুল কিনিয়া আনি।"

ঠাকুর-মা দেখিলেন, লীলা এখনও তেমনি বালিকার মত চঞ্চল, তাঁহাকে টানাটানি করিতে করিতে তাহার অযত্ন-বিবর্দ্ধিত কেশদাম যেমন মুখের উপর পড়িতেছে, অমনি হাত ছাড়াইয়া কেশগুলি সরাইয়া আবার টানাটানি আরম্ভ করিতেছে। তাহার অলোকসামান্য রূপের গৌরব এখনও সে বুঝে নাই। লীলা যে মাধুরী ছড়াইয়া চলিয়া যায়, এখনও সে মাধুরী সে পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। লীলার ঠাকুর-মা লীলার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া মনে মনে বলিলেন, "ষাট্ ষাট্! এর মধ্যে আমার দুধের বাছা সোমত্ত হইল কবে?"

তা যাহা হউক, পরেই লীলাকে ধরিয়া, কাছে বসাইয়া, সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া, ঠাকুর-মা বলিলেন, "দিদিমণি! তোমার আর যাইয়া কাজ নাই, আমি তোমার পুঁতুল কিনিয়া আনিব।"

লীলা বলিল, "সেঁকিঁ! আঁমি নিঁজে যাঁইয়া পুঁতুল কিঁনিয়া আঁনিব, আঁমি বাঁছিয়া রাঁখিয়া আঁসিয়াছি।" এই সময় লীলার সুরটা একটু নাকি নাকি হইয়াছিল। আমরা

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঠাকুরমার আদরের লীলা—ঠাকুরমার কথায় প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাহার সুরটা একটু নাকি হইয়া আসিত। আর প্রায় তাহার সেই ডাগর-ডাগর চোক দুইটায় এক ফোঁটা জল দেখা দিত। ঠাকুর-মা অনেক সময় "পান্‌সে চোক" বলিয়া জল মুছাইয়া দিতেন, তবে তাহার কথার প্রতিবাদের সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুটার কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমাদের ভাঙ্গিয়া বলেন নাই।

বলিতে বলিতে আবার আগেকার মতন লীলার চক্ষে জল দেখা দিল। ঠাকুর-মা গলিয়া গেলেন, লীলাকে কেমন করিয়া মেলায় লইয়া যাইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় গোবিন্দ ঘোষের চাকর নফর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নফর দেখিল, লীলা ঠাকুরমার সঙ্গে মেলায় যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, আর ঠাকুর-মা, একা যাওয়া হইবে না বলিয়া, তাহাকে নিরস্ত করিতেছেন। তখন নফর সাম্‌নে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর-মা! আপনাদের ভাবনা কি? যদি আপনার নাতিনীর যাইতে এত ইচ্ছা হয়, আমি না হয় আপনাদের সঙ্গে যাইব, আমার কাজ প্রায় হইয়া আসিল; এই কয়েক কলসী জল আনিলেই হয়।"

ঠাকুর-মা তাঁহার অকূল সমুদ্রে কিনারা পাইলেন। লীলার মুখে হাসি দেখা দিল। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিধাতার হস্তে লীলার ভাগ্যসূত্র ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, আবার জোড়া লাগিল।

সেদিন কিন্তু নফরের কাজ অন্য অন্য দিনের মত শীঘ্র সারা হইল না। ঠাকুর-মা জিজ্ঞাসা করিলে নফর বলিল,

"বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছে, কাজ বাড়িয়াছে; তবে হ'ল ব'লে।" নফর এক কলসী জল লইয়া হন্ হন্ করিয়া নীলরতনের ঘরের দিকে গেল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নফর আসিয়া বলিল, "চল দিদিমণি! মেলা দেখিয়া আসি।"

লীলা আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল; ঠাকুরমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ঠাকুরমার মনটা যাইবার সময় কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দরজার বাহির হইতেই চৌকাটে তাঁহার পায়ে হোঁচট লাগিল। তা লীলা তাঁহাকে থামিতে দিল না।

পোড়া মনোহারী-দোকানদারগণ কি চমৎকার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে, দেখিলে চক্ষু সরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ পুঁতুলটা, ঐ চিরুণীখানি, ঐ আর্সিখানি, ঐ পুঁতির মালা, ঐ খেলাঘরের আলমারী, খেলার আল্না—আর কত জিনিস,—লীলা কোন্‌টী লইবে? ঠাকুর-মা বলিলেন, "যে দোকানে জিনিস পছন্দ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, সেই-খানে চল। আহা! সে দোকনদার মিন্সে বড় ভালমানুষ।" লীলা কিন্তু দোকান হইতে চক্ষু সরায় না, অগত্যা ঠাকুর-মা লীলাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। লীলাও অগত্যা চলিল, তবে বড় আস্তে আস্তে।

ঠাকুর-মা অনেক দূর চলিলেন, কিন্তু সে দোকান ত খুঁজিয়া পাইলেন না। ভাবিলেন, বুঝি পথ ভুলিয়াছেন। তখন নফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দোকান কোথা?" নফর বলিল, "কোন্ দোকান?" ঠাকুর-মা অপ্রস্তুত হইলেন

তাইত, নফর ত সকালে সঙ্গে আসে নাই! এদিকে ক্রমেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

তখন ঠাকুর-মা আর এক দোকান হইতে জিনিস লইবেন ঠিক করিলেন। কোন্ দোকানে যাইবেন, লীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদল বড় কীর্ত্তন-ওয়ালা খোল করতাল বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে এক দোকানে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কি জনতার স্রোত! ওকি গো, লোককে যে ঠেলিয়া লইয়া যায়! ঠাকুর-মা লীলার হাত ধরিয়া হাঁ করিয়া কীর্ত্তন শুনিতে-ছিলেন, এমন সময় পিছন হইতে এক ধাক্কা আসিল। ঠাকুর-মা লীলার হস্ত ছাড়াইয়া সজোরে এক দোকানদারের সাজানো জিনিসের উপর পড়িয়া গেলেন। সে ঠাকুরমাকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ঠাকুর-মা সাম্‌লাইয়া উঠিতে ছিলেন, এমন সময় আবার এক ধাক্কা। তার পর আবার এক ধাক্কা। ঠাকুর-মা আবার দুইবার দোকানদারের সাজানো জিনিসের উপর পড়িলেন। মিক্সের জিনিসগুলো তচ্ নচ্ হইয়া গেল। দোকানদারও ঠাকুরমাকে কেবলমাত্র মারিতেই বাকি রাখিল। তা হউক, ঠাকুর-মা এই সব অপমান সহ্য করিয়া—ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া লীলাকে ডাকিলেন, কিন্তু লীলাকে সাম্‌নে দেখিতে পাইলেন না। ঠাকুর-মা কত ডাকিলেন। সেই গোলযোগে তাঁহার কথা কে শোনে? বিশেষ, সেই সময় সুবিধা বুঝিয়া এক জুয়াচোর সেই দোকানদারের ছড়ান কতকগুলি জিনিস সরাইতেছিল, দোকানদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। "চোর চোর" বলিয়া একটা রব উঠিল। সেই

রবে ঠাকুর-মার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। ঠাকুর-মা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর ঠাকুর-মা কতবার নফরকে ও কতবার লীলাকে ডাকিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না।

ঠাকুরমার ক্রন্দন শুনিয়া, দু-একজন লোক সেখানে দাঁড়াইল। ব্যাপার শুনিয়া একজন বলিল, "আহা, লীলা বেশ নামটী, তা লীলা তোমার কে হয় গা?" একজন বলিল, "তা বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; ছোট ছোট ছেলে-পুলে লইয়া এই সব মেলায় আসে?" এক জন বলিল, "দে মাগী, পুলিসে খপর দে।" শেষে একজন দয়া করিয়া লীলার ঠাকুরমাকে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চাহিল। ঠাকুর-মা তাহার সঙ্গে চক্ষু মুছিতে মুছিতে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী পৌঁছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভিতরের কথা।

বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। সূর্য্যদেবের ঘোড়াগুলি আস্তাবল-মুখো হইয়া সবেগে ছুটিয়াছে। সূর্য্যদেব রাশ কষিয়া রাখিতে পারিতেছেন না বলিয়া, চটিয়া লাল হইয়াছেন। রৌদ্রগুলা মাটী হইতে লাফাইয়া একেবারে গাছে, গাছ হইতে পাহাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ধ্যার আঁধ-ছায়া পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকি মারিতেছে। পাখীগুলা কলরব করিয়া রৌদ্রকে থামিতে বলিতেছে। এমন সময় রামনগরের গোপাল মুকুয্যে তাঁহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গোপাল মুকুয্যের ভ্রূ কুঞ্চিত। চক্ষু যেন সম্মুখের জিনিস ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতেছে। হস্ত মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁকায় সজোরে টান পড়িতেছে। দেখিলেই বোধ হয়, মুকুয্যে মশাই কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সময় পাঁচু সেখ হুগলি হইতে

সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছিল। গোপাল মুকুয্যেকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি গো দাদাঠাকুর! প্রণাম! সব ভাল ত ?"

গোপাল পাঁচুকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে, পাঁচু নাকি ? সাক্ষী দিয়ে এলি ? ব'স ব'স, আজকের খপর বল্ ?"

পাঁচু তখন সসম্ভ্রমে গোপালের হুঁকার কলিকাটি তুলিয়া লইয়া একটু সরিয়া গিয়া গোটা কতক টান দিল, পরে সাক্ষী দিতে গিয়া সে যে নূতন কাপড় চাদর পাইয়াছিল, পাছে সেই কাপড়ে ধূলা লাগে বলিয়া সযত্নে ধূলা ঝাড়িয়া গোপালের সম্মুখে বসিল। গোপাল সোৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন পাঁচু আপনিই আরম্ভ করিল ;—

"আর দাদাঠাকুর, খপর কি! খপর সব ভাল। যেখানে খোদ নীলরতন রায় মোকর্দ্দমার যোগাড়ে, আর সাক্ষী পাঁচু সেখ, সেখানে সর্ব্বদাই জয় জয়কার।" নিজের সাক্ষী দিবার গৌরব করিবার সময় পাঁচু একবার বুকে হাত দিয়া বুক ফুলাইয়াছিল।

গোপাল তখন একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আরে, তা ত জানাই আছে, তবুও খপরটা কি, বল্ না ?"

পাঁচু একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, খপর—আংটি-চুরির অপরাধে গোবিন্দ ঘোষের হাজত, আর অমূল্যকুমার মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে বলিয়া, কেন ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইবে না, তজ্জন্য তাহার উপর নুটিস হইয়াছে।"

কথাটা বলিয়াই পাঁচু একটু জাঁকাইয়া বসিল। বলিল, "হইবে না কেন, স্বয়ং পাঁচু সেখ যে সাক্ষী! আর এই রকম

মোকর্দ্দমা বছরে দু-চারটা হ'লে হয়;—পাঁচুকে আর চাষ করিয়া খাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়াই কিন্তু গোপাল মুকুয্যের মুখটা কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল। সেই গোবিন্দ ঘোষ, সেই নিরীহ ভদ্র লোক, যিনি কখন লোকের সাতেও নাই—পাঁচেও নাই, তিনি আজ নিরপরাধে হাজতে, হয় ত অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবেন। হা ধর্ম্ম! এখনও তুমি জগতে আছ!

পাঁচু কিন্তু অতটা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "যুক্তিটা কিন্তু হইয়াছিল ভাল; ভাগ্যে বাবু নফরাকে হাত করিয়াছিলেন; তা না হইলে গোবিন্দ ঘোষ যে রকম চালাক ও তাঁর দিকে যে রকম লোক দেখিতেছি, এতদিনে কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, কে জানে?"

গোপাল মুকুয্যে কুচক্রীদের পরামর্শ কতক কতক অবগত ছিলেন এবং গোপনে গোবিন্দ ঘোষ ও অমূল্যকুমারকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে—নিজে আদালতে হাজির হন নাই, কেবল নীলরতনের ভয়ে। তা হউক. তিনি পাঁচু সেখের মুখে আবার সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঁচুকে বলিলেন, "তাই ত, আমি তো নফরার সঙ্গে কি হইয়াছিল জানি না, বাবু কেমন করিয়া তাকে হাত করিলেন?"

পাঁচু বলিল, "বলিতে গেলে সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তা আপনাকে বলিতেই বা দোষ কি?" পাঁচু সাক্ষী দিয়া একটু ফুলিয়া উঠিয়াছিল। পাঁচু বলিতে লাগিল, "মেলায় আমি বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া যেমন মেয়েটিকে

দেখা, অমনি আমার উপর হুকুম হইল, ওকে চুরি করিতে হইবে। গোবিন্দ ঘোষটা কিন্তু চালাক, গোড়া হইতে বাধা দিয়াছিল। তা হইলে কি হয়? ব্যাপার দেখিয়া বাবু টাকা দিয়া নফ্‌রাকে হাত করিলেন। আঃ! সে অনেক টাকা। পাঁচু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তা যাই হ'ক, নফর কৌশলে মেয়েটাকে ও তাহার ঠাকুরমাকে পথ ভুলাইয়া রাত্রে মেলার মধ্যে যেখানে খুব গোলযোগ, সেইখানে লইয়া গেল। পরে পিছন হইতে আমি ধাক্কা দিয়া বুড়ীটাকে মেয়েটার কাছ হইতে সরাইয়া দিলাম। তার পর একটা লাঠিয়াল আর দুই জন চাকর সঙ্গে মেয়েটাকে পাঠান হইল। এদিকে বুড়ী মাগী বাড়ীতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলে, বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তখন অনেক লোক সন্ধানে বাহির হইল, আর আমাদের বাবুরই বা উৎসাহ দেখে কে? তিনি নিজে কত সন্ধান করিলেন। কত সলা-পরামর্শ দিলেন। কত তামাক পোড়াইলেন, তা আর কি বলিব! গোবিন্দ ঘোষটা কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বাবুকে সন্দেহ করিয়াছিল; আর তেমনিই হেমন্তকুমারকে লিখিয়া দিল। পরে বাবু আপনার সাফাই করিবার জন্য ঘটনার তিন দিন পর পর্য্যন্ত গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী রহিলেন। আর ইতিমধ্যে নফরকে দিয়া তাঁহার হীরের আংটিটী গোবিন্দের স্ত্রীর গহনার বাক্সে রাখাইয়া দিলেন। এদিকে হেমন্তকুমার অমূল্যকে চিঠি লিখিল। সে ছোঁড়া নাকি কলিকাতায় ইংরাজি পড়ে, একেবারে তাড়াতাড়ি আসিবার সময় কাহাকে কিছু না বলিয়া বাবুর নামে পুলিসে স্ত্রী-চুরির দাবি দিয়া আসিল। দারোগা আসিয়া বাবুর বৈঠক-

থানায় অনেক তামাক পোড়াইয়া গেল, আর কি একটা পরামর্শ করিয়া চলিয়া গেল। তার পর—তার পর এই মোকর্দ্দমা।"

গোপাল মুকুয্যে বলিলেন, "বুঝিলাম না, গোবিন্দ ঘোষকে নাকাল করিবার জন্য এত চেষ্টা কেন?"

পাঁচু বলিল, "বাবা, ওকে না জব্দ করিলে রক্ষা আছে! লোকটা বড় চালাক! আর একটু হইলে আমাদের ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! বিশেষ গ্রামশুদ্ধ লোক উহার পক্ষ। ও, নিজে খালাস থাকিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিলে, এতদিনে না জানি কি হইয়া যাইত। এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!—নিজে বাঁচিবেন, না অপরকে বাঁচাইবেন!"

এই সব কথা বলিতে বলিতে পাঁচু আর এক ছিলিম তামাক সাজিতেছিল। তামাক সাজা হইলে একটু সরিয়া গিয়া, গোটা কতক টান দিয়া, কল্‌কেটী মুকুয্যের হুঁকায় বসাইয়া দিয়া পাঁচু আবার বসিয়া বলিতে লাগিল, "তা হউক দাদা ঠাকুর! এত করিয়াও কিন্তু বাবু কিছু করিতে পারেন নাই, শীকার ফস্‌কাইয়াছে!"

গোপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি!" পাঁচু সরিয়া আসিয়া গোপালের কাণের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ঘরের কথা বলিতে নাই, তা হউক, আপনার না জানা কি আছে? ছুঁড়িটা মাঠাকুরাণীর হাতে পড়িয়াছে, তিনি তাকে অভয় দিয়া আপনার কাছে রাখিয়াছেন! কর্ত্তার সেখানে টুঁ-শব্দ করিবার যো নাই।"

মুকুয্যে মহাশয়ের বুক হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কেমন করিয়া হইল?"

পাঁচু বলিল, "লইয়া যাইবার সময় বাড়ীর কাছে কেমন করিয়া ছুঁড়িটার মুখের কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছিল, তাই সে বাড়ীর সাম্‌নে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সেই চীৎকার গিন্নী শুনিতে পাইয়া মেয়েটীকে বাড়ীতে আনেন। তার পর কর্ত্তার গুণাগুণ ত তাঁহার আর অবিদিত নাই,—সেই অবধি তিনি মেয়েটাকে আপনার কাছে রাখিয়াছেন।"

এই সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে একটা লোক মুকুয্যে মশাইকে ডাকিতে আসিল। বাড়ীর ভিতর হইতে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া, মুকুয্যে মশাই যাইতে উদ্যত হইলেন, পাঁচুও উঠিল; যাইবার সময় সে তাহার পাওনা নূতন কাপড়খানার পাড় তুলিয়া গুছাইয়া পরিল ও কোঁচান নূতন চাদরখানি ঝাড়িয়া গলায় ফেলিয়া দিল; পথে যাইতে যাইতে দুই চারিবার ফিরিয়া দেখিতেছিল, তাহাকে পিছন হইতে কেমন দেখায়।

ভাল কথা,—আমরা আগে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, গোপাল মুকুয্যে অমূল্যকুমারের পিতার সহাধ্যায়ী, আর তিনিই অমূল্যকুমারকে উত্তম পাত্র দেখিয়া লীলার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হৈমবতীর অনুরোধ।

অনেক দিনের পর নীলরতন রায় অন্দরে আসিয়াছেন। তাঁহার অন্দরে আসা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না, আর যদি কখন আসিতেন, তা ভার্য্যা হৈমবতীর অনেক ডাকা-ডাকি, সাধা-সাধি, মাথা-কোটাকুটির পর। এবারেও তাই হইয়াছে। হৈমবতী অনেক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাই আজ নীলরতন অন্দরে। তা অন্যবারে যাইবার সময় নীলরতনের মুখ এতটা ভার-ভার থাকিত না। নীলরতন বুঝিয়াছিলেন, হৈমবতী সেই মেয়েটার একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য ডাকিতেছেন।

নীলরতন অন্দরে আসিলেই দেখিতে পাইতেন যে, হৈমবতী তাঁহার জন্য একথাল খাবার সাজাইয়া পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তারপর এটা খাও, সেটা খাও, আর তারপর কথার ঘেন্-ঘেনানি, — তা অত কথা তাঁহার ভাল লাগিত না। নীলরতন বিরক্ত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেন। যেখানে মেয়েমানুষের

মুখে ইয়ারকির ফোয়ারা ছোটে না, যেখানে বাঁধা হুঁকায় বাঁয়া তবলায় আসর জমকায় না, যেখানে মানুষের পশুবৃত্তি-নিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না. সেখানে নীলরতন রাজে! ছি! ছি! হৈমবতী, তুমি ত এ সব করিতে পারিবে না, তবে নীলরতনের আশা কেন? আর পাঠক মহাশয়! আপনি বলিতেছেন, নীলরতনের বয়স হইয়াছে, তাহার এ বয়সে এরূপ স্বভাবের চিত্র ভাল লাগে না। না লাগিবারই কথা, কিন্তু আমরা কি করিব? নীলরতনকে যেমন দেখিয়াছি, তেমনি আপনাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছি। নীলরতন যৌবন বয়স হইতেই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিলেন, তাঁহার অনেক ধন ও অপরিমিত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বুঝাইবার লোক ছিল না, তাই তাঁহার ধনের অপব্যয় হইত, ক্ষমতার অপব্যবহার হইত, আর তাই আজ বয়স হইলেও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হয় নাই। তবে বলিয়া রাখা ভাল, নীলরতনের স্বভাবের তাঁহার সমবয়স্ক অনেক লোক ছিল। আজকাল নীলরতনের আমোদপ্রমোদ অধিকাংশ সময় তাহাদেরই সঙ্গে চলিত। তবে চাকর-বাকর ঘরের দুটা কথা জানিত, তাহা স্বতন্ত্র কথা। আর বয়স হইলেও নীলরতনের শক্তি-সামর্থ্য কমে নাই, বরং কৃষ্ণকান্তির উপর একটু চাক্‌চিক্য হইয়াছিল।

কি বলিতেছিলাম।—নীলরতনের মুখখানি আজ বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত। অন্দরে আসিবার পথেই কি করিয়া হৈমবতীর কথাটা উড়াইয়া দিবেন, ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন। অন্দরে ঢুকিয়াই আবার সেই একথাল খাবার; বরং অন্যদিনের চেয়ে আজ আয়োজন বেশী, তেমনি সাজানো, তবে তফাতের

মধ্যে হৈমবতী পাশে নাই। দেখিয়াই নীলরতনের মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল। নীলরতন এত করিয়া হৈমবতীকে জ্বালাইয়াছেন। সমস্ত মাসের মধ্যে একদিনও তাঁহাকে দেখা দেন নাই, একদিনের তরে তাঁহাকে আদর করেন নাই, ভাল-বাসেন নাই, কিন্তু তবু তাঁহার উপর হৈমবতীর অবিচল ভক্তি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়াছেন, আজ কি সেই হৈমবতী তাঁহাকে ডাকিয়া দেখা দিতেছেন না? তা হইলেত হয়; নীলরতন এক-বার তাহাকে দেখা দিয়াই পলাইবেন,—কতকগুলা ঘেনঘেনানি আর তাঁহাকে শুনিতে হয় না। কিন্তু কথাটা কেমন মনে লাগিল না। সাত পাঁচ ভাবিয়া নীলরতন ডাকিলেন, "হৈমবতি!"

ক্ষীণ মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "কে, তুমি আসিয়াছ? এসো, ব'সো।" সেই স্বরের সঙ্গে কি একটা কাতরতা—কি একটা কোমলতা জড়ান ছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত্যাকারীর জীবন-ভিক্ষায় সে কাতরতা নাই। বৈশাখী সান্ধ্য-সমীরণে কুসুম-সুবাস মিশাইলে সে কোমলতা মিলে না।

নীলরতন সেই স্বর শুনিয়া চমকিলেন, পরে যাহা দেখি-লেন, তাহাতে যেন তাঁহার সংজ্ঞা দেহ ছাড়িয়া গেল। সেই প্রশস্ত কক্ষের এক কোণে ক্ষুদ্র বিছানায় হৈমবতী শয়ানা। দেহ এত ক্ষীণ যে, বিছানায় কেহ শুইয়া আছে বলিয়া জানা যায় না, হৈমবতী আর সে হৈমবতী নাই।

মুহূর্ত্তেকে নীলরতনের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নীলরতন হৈমবতীর বিছানায় গিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করি-লেন, "হৈমবতি, একি?"

হৈমবতী উত্তর দিলেন, "বলিতেছি, আগে জল খাও।"

আবার সেই জল খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি। নীলরতন জল খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, হৈমবতী বলিলেন, "চল, আমি পাশে গিয়া বসিতেছি।" হৈমবতী অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেই যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। নীলরতন আস্তে আস্তে তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে হৈমবতী প্রকৃতিস্থ হইলে নীলরতন আবার ডাকিলেন, "হৈমবতি!"

হৈমবতী বলিলেন, "জল খাও।"

অগত্যা নীলরতন জলখাবারের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন ও নামমাত্র জল খাইলেন। অল্প পরেই উঠিয়া আসিয়া আবার বিছানার পাশে বসিলে, হৈমবতী বলিলেন, "মনে বড় দুঃখ রহিল, আজ তোমাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।"

কথা শুনিয়া নীলরতন মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চোক দুটায় কেমন জল আসিয়া পড়িতেছিল।

তখন নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৈমবতি! এ সংবাদ দাও নাই কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "কি সংবাদ? কিসের সংবাদ? কাহাকে দিব? যে দিন হইতে তুমি আমায় পায়ে ঠেলিয়াছ, সেও ত আজ বিশ বৎসরের কথা,—সেই দিন হইতেই মৃত্যুকামনা করিতেছি, শীঘ্রই বুঝি অনেক দিনের আশা সফল হয়।" হৈমবতী থামিলেন, আবার একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাহার বাঁচিয়া সুখ, সে চিকিৎসা করাক।"

নীলরতন কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছিলেন। হৈমবতী বুঝিতে পারিলেন। তখনই বলিলেন, "রাগ করিও না, পীড়া

হঠাৎ হইয়াছে, বলিবার সময় পাই নাই।" হৈমবতী মিথ্যা কথা বলিলেন। তিনি অনেক দিন হইতে অন্তরে অন্তরে পীড়া পোষণ করিতেছিলেন, তার পর এ পীড়া ইচ্ছা করিয়া আনিয়াছেন।

নীলরতন বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন চিকিৎসা করাইতে হইবে।"

হৈমবতী বলিলেন, "চিকিৎসা করাইলেও যে বাঁচিব, সে আশা বৃথা।"

এখন নীলরতন হৈমবতীর মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে লাগিলেন।—ধীরে ধীরে হৈমবতীর গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, "হৈমবতি!"

হৈমবতী নীলরতনের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহার চক্ষু নীলরতনের চক্ষুর উপর স্থাপিত হইলে জলে পুরিয়া আসিল। নীলরতন অনেকদিন এমন করিয়া হৈমবতীর গায়ে হাত দেন নাই। হৈমবতী মনে মনে বলিলেন, আর দু-দিন আগে অমন করিয়া ডাক নাই কেন? তাহা হইলে বুঝি বা রোগের প্রতিকার হইত।

নীলরতন কিন্তু সেই শীর্ণ বিবর্ণ আধিক্লিষ্ট অথচ প্রশান্ত মুখ আর সেই জল-ভরা চক্ষু দুটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তখন হৈমবতী বলিলেন, "অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন? ভয় নাই।"

সেই সময়, নীলরতন হৈমবতীর উপর যত অত্যাচার করিয়াছিলেন, আর হৈমবতী কেমন করিয়া সে সব অত্যাচার

সহিয়াও নীলরতনের মঙ্গল কামনা করিতেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন, সেই সব কথা নীলরতনের মনে পড়িতেছিল। একবার অসুখ হইলে হৈমবতী কেমন করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, নিজে অশক্ত হইয়া শেষে পীড়ায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পর পাছে নীলরতন জানিতে পারিলে আর শুশ্রূষা করিতে না দেন, তাই সে কথা লুকাইয়াও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন;—আর একবার পিতৃগৃহে নীলরতনের নিন্দা শুনিয়া কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, আর কতবার তাঁহার পায়ে কাঁটাটী ফুটিলে নিজের গলা কাটিয়া সে কাঁটা তুলিতে গিয়াছিলেন,—সেই সব কথাও নীলরতনের মনে আসিতে লাগিল; তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখা দিল, স্বরটা জড়াইয়া আসিল।

নীলরতন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "না, ভয় নাই হৈমবতি! আজ বুঝিতেছি, আমার পাপের চারি পোয়া পূর্ণ হইয়াছে, ভরা ডুবি হইতে আর বাকি নাই। নহিলে তোমার এমন রোগ হইবে কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "না, অমন কথা বলিতে নাই। ভগবান্ তোমায় সুমতি দিবেন। তবে আজ যে জন্য ডাকাইয়াছি, তাহা তোমায় করিতে হইবে। লীলাকে ফিরাইয়া দাও।"

কথা শুনিয়া নীলরতন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর হৈমবতী বলিলেন, "কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে বুঝিতে পারিতেছ না? এখনও সময় আছে, লীলাকে আমার সঙ্গে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া দাও, আমি গিয়া হেমন্ত-

কুমারের পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া আসিব। আমার এ অবস্থা দেখিলে তাহারা আমার কথায় অমত বা অবিশ্বাস করিবে না।"

নীলরতন ঘাড় হেঁট করিলেন। হৈমবতী যে তাঁহার শত্রুর বাড়ী যায়, তাহা নীলরতনের ইচ্ছা নয়। পরে বলিলেন, "তোমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমাকে পাঠাইতে পারি না। দু'দিন যাক্, একটু সারিয়া উঠ, তাহার পর বিবেচনা করা যাইবে।"

হৈমবতী বুঝিলেন, নীলরতন তাঁহার প্রস্তাবে রাজি নহেন; তখন বলিলেন, "শোন, এতদিন কোন্‌কালে আমি লীলাকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতাম, তা কেবল তোমার অনভিমতে কেহ আমার কথা শোনে না বলিয়াই এতদিন পাঠাইতে পারি নাই। আর আমার বিশ্বাস, লীলাকে রাখিলে আমায় বাঁচাইতে পারিবে না। তাহার প্রতি-উষ্ণশ্বাসে তোমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। তারপর যতদূর শুনিয়াছি, লীলার শ্বশুরের ধনুক ভাঙ্গা পণ,—তোমাকে সহজে ছাড়িবে না।"

হৈমবতী অনেক কষ্টে কথা কহিতেছিলেন, এতক্ষণ কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। বিশেষ এখনও নীলরতন তাঁহার কথা শুনিলেন না, এ দুঃখ তাঁহার বুকে বড় বাজিল।

নীলরতন ডাকিলেন, "হৈমবতি!"

কেহ তাঁহাকে সাড়া দিল না। নীলরতন দেখিলেন, হৈমবতী অচেতন।

নীলরতন অনেক যত্নে হৈমবতীর চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। কতক্ষণ পরে হৈমবতী নীলরতনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বড়ই কাতর-স্বরে বলিলেন, "শোন,

আমার একটা কথা রাখ। লীলার উপর অত্যাচার করিলে ভগবান্ তাহার প্রতিফল দিবেন। এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে। একবার ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া—আমার মুখের দিকে চাহিয়া অঙ্গীকার কর, লীলাকে ফিরাইয়া দিবে? আমি সুখে মরিতে পারিব।” হৈমবতীর স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, তাঁহার হাত নীলরতনের হাত ছাড়িয়া পায়ে পড়িল।

পূর্ব্ব হইতেই নীলরতনের হৃদয় গলিয়াছিল। তিনি হৈমবতীর উপর অত্যাচার করিয়াও যে, স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রতিদান পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া আপনা আপনিই কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। তারপর হৈমবতীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নীলরতন আর ‘না’ বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, “ভাল, তোমারই কথামত কার্য্য করিব।” নীলরতন বলিলেন বটে, কিন্তু কি করিয়া লীলাকে প্রত্যর্পণ করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তখন হৈমবতী দুটী হাত জুড়িয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভগবান্ তোমায় সুমতি দিন, আমার কাজ হইয়াছে, আমি সুখে মরিতে পারিব।”

ক্ষণপরেই হৈমবতী আবার অজ্ঞান হইলেন। এবার নীলরতন ডাকিয়া উত্তর পাইলেন না। এবার হৈমবতীর শীঘ্র সংজ্ঞা না হওয়ায়, নীলরতনের আর সাহসে কুলাইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বাড়ীর লোক-জন ডাকিলেন, মুহূর্ত্তেকে একটা ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল।
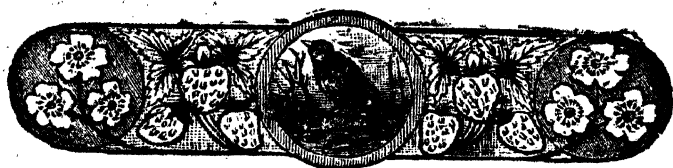
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘরের খবর।

এই ঘটনার পর নীলরতন কয়দিন অন্দরে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছিলেন। ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনাতে, আত্মীয় কুটুম্বগণের ফুস্‌ফুসানিতে, চাকর বাকরদের কাণাকাণিতে, ঔষধ পেসার ঘস্‌ঘসানিতে নীলরতনের অন্দর দিন কতক সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"কেমন আছে ?" "কেমন দেখ্‌চ ?" যিনি দুই মিনিট হইল রোগীর কক্ষ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি দুই মিনিট পরেই রোগীর কক্ষ হইতে আর একজন লোককে আসিতে দেখিলে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "এখন কেমন আছে ?" ডাক্তার কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেই, কি একটু জীব কাটিলেই একেবারে "হায় হায়" শব্দ পড়িয়া যাইতেছিল, যেন হৈমবতী আর নাই। এদিকে আবার অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ স্বস্ত্যয়নে বসিয়া গিয়াছিলেন। অন্য লোকের কাছে অহঙ্কার করিয়া বলিতেছিলেন, আমাদের স্বস্ত্যয়নে গ্রহদোষের

নিশ্চয়ই শান্তি হইবে, হৈমবতীর আর ভয় নাই। তবে আপনা আপনির মধ্যে কথাটা হইতেছিল—"কেমন হে, ক্ষীরোদ ডাক্তারের চিকিৎসাটা কেমন? না বাঁচাইতে পারিলে অনেক টাকা লোকসান হইবে।"

আত্মীয়কুটুম্বদের মধ্যে যাঁহারা শুধু "চোকের দেখা" দেখিতে ও "হায় হায়" করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রোগীর ঘরে যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহারা দরজার ফাঁক হইতে উঁকি মারিয়া "কেমন, এখন লোক চিন্‌তে পার্‌ছে ত?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সরিয়া আসিতেছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কয়জন পাশের একটী ঘরে জটলা করিয়া "কেমন করিয়া সাবু তৈয়ার করিতে হয়"—"এ সময় মিছরির পানা খাইতে দেওয়া উচিত কিনা"—"ক্ষীরোদ ডাক্তারকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহার জায়গায় শশী ডাক্তারকে আনা যুক্তিসঙ্গত কি না"—ইত্যাদি বিষয়ে গুরুতর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। হরিশের মেয়ের ব্যামর সময় কেমন করিয়া শশী ডাক্তার মরাজীব বাঁচাইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শশী ডাক্তারের একটী আত্মীয় শশীর পশারেরও জোগাড় করিতেছিলেন। হৈমবতীর দুইটী দূরবর্ত্তী আত্মীয়, যাহারা কিছু করিয়া মাসহারা পাইত ও যাহারা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মাসহারা বজায় রাখিবার জন্ত এক পেট "ডাক ছাড়া কান্না" সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা এখনও কাঁদিবার সময় হয় নাই দেখিয়া, এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে ঘন ঘন "কেমন আছে" জিজ্ঞাসা করা বাদ যায় নাই, তবে সে জিজ্ঞাসা হইতেছিল, যাহারা রোগীর ঘর হইতে আসিতেছিল

তাহাদিগকে। নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসা বা সেবা-শুশ্রূষা করা ইহারা বাড়ার ভাগ মনে করিয়াছিল।

এই সব আগন্তুকের দল যে ঘর জুড়িয়া বসিয়াছিল, বাড়ীর নীরদা চাকরাণী সেই ঘর দিয়া কি একটা কাজে যাইতেছিল। নীরদা বাড়ীর ঝি, গৃহিণীর কাছে থাকে, ঘরের কথা জানে; সুতরাং আজ তার নিকট দু-একটা বড় ঘরের কথা না শুনিয়া যাওয়া সঙ্গত নয় মনে করিয়া আগন্তুকদের মধ্যে তাহাকে এক-জন ডাকিয়া বলিল, "নীরদা! কোথা যাচ্চিস্?" নীরদা ঠিক জবাব না দিয়া বলিল,—"বাবা, আর পারিনে, ফর্‌মাস খাটিতে খাটিতে পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া গেল, শরীরটা যেন আর বয়না!"

১নং আগন্তুক। তা তো দেখ্‌তেই পাচ্চি। আহা, তোর যে কাজ! তা হউক, আপনার শরীরের দিকেও নজর রাখ্‌তে হবে। এমন কি তাড়াতাড়ির কাজ! না হয় দু'দণ্ড পরে হবে এখন। খানিক ব'স।

নীরদা। বসি বা কেমন ক'রে? মার কি রকম,—আমি না হইলে যেন চলিবে না, এত ত আর সব ঝি রহিয়াছে, কিন্তু আমি না করিলে তাঁহার কোন কাজই পছন্দ হয় না।

নীরদার কাজ গৃহিণীর বড় পছন্দ-সই ও সেইজন্য সে গৃহিণীর প্রিয়পাত্র, ইহা জানাইয়া নীরদা আপনার একটু পসার করিয়া লইল।

১ নং আগন্তুক একটু মন রাখিয়া বলিল,—"এই ত এত বড় বাড়ী, এক একটা মহল নয় ত—যেন এক একখানি গাঁ; সব ঘরগুলো ঝাঁট দেওয়াই পাঁচটা চাকরের কাজ, তা একজনের উপর সব বরাত দিলে কি চলে?"

২।৩ নং আগন্তুক "তা বই কি, তা বই কি" বলিয়া উঠিল। নীরদা আগন্তুকদের মধ্যে বসিল।

তখনই ১ নং আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যা নীরদা! এবার নাকি গিন্নী এ ব্যায়রামটা নিজে করিয়াছেন?"

নীরদা। ওমা, সেকি গো! ব্যায়রাম কি নিজে করা যায়? নীরদা আকাশ হইতে পড়িল।

১নং আগন্তুক সাম্‌লাইয়া লইল,—"বলি তা নয়—তা নয়, তবে এবার নাকি ব্যাম হ'লেও গিন্নী অনেক দিন কর্ত্তাকে জানান নাই।"

নীরদা। কে জানে বাবু! বড় ঘরের বড় কথা! ও সব কথা দেখিতে শুনিতে নাই, আমরা চোক থাক্‌তেও কাণা, কাণ থাকৃতেও কালা।

নীরদা যে ভিতরের কথা জানে, তাহা আভাস দিল।

১ নং আগন্তুক একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা বটেই ত, বড় মানুষদের কি আর হাত পা আছে, তোমরাই ত সব; আর তোমরা সব বলিয়া দিলে ওদের কি আর মান-সম্ভ্রম থাকে!"

নীরদা। ১ নং আগন্তুকের কাছে একটু সরিয়া গলার আওয়াজটা একটু ছোট করিয়া বলিল; "না বল্লেও বাঁচিনি, আর বলিই বা কেমন ক'রে? তবে তোমরা নাকি গিন্নীর নেহাত আপনার লোক, কিছু দায়-অদায় পড়্‌লে দেখ্‌তে তোমরা বই আর কেউ নাই,—তাই তোমাদের কাছে বল্‌তে দোষ নেই।"

আগন্তুকের দল একটু সরিয়া আসিয়া নীরদাকে ঘেরিয়া বসিল।

নীরদা। দেখ, আমাদের কর্ত্তার এই যত অনাসৃষ্টি কারখানা। সেদিন কার বউ ধ'রে এনেছেন। আর সেই বউটী আমাদের গিন্নীর হাতে প'ড়েছে। আহা, মেয়েত নয়, যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী! এমন মেয়ে ত দেখি নাই। তা গিন্নীর জেদ, তাকে ফিরিয়ে দেবেন; তাই কর্ত্তাকে ক'দিন থেকে অন্দরে আস্‌তে বল্‌ছিলেন, তা কর্ত্তাটী কিন্তু তেমন নয়, গিন্নির কথাটা কাণে তোলেন নাই, তাই মনের দুঃখে গিন্নি তিন দিন জলস্পর্শ করেন নাই; তার পর চার দিনের দিন সেই মেয়েটীই আবার গিন্নীকে জল খাওয়ায়। তা অত সহিবে কেন? ও শরীরে কি. অত সয়? সেই উপবাস হইতেই জ্বর হয়। পরে পাঁচ ছয় দিন কাহাকেও কিছু বলেন নাই, কর্ত্তাও খবর পান নাই; সেই জ্বরের উপরই সব করিয়াছেন, তার পর যা হইয়াছে, দেখিতেছ।

নীরদা চুপ করিল, কিন্তু আগন্তুক-দলের মধ্যে বউটীর কথা শুনিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি, চোক-টিপা-টিপি, কাণা-কাণি পড়িয়া গেল। "কাদের বউ গা? কত বয়স গা? দেখিতে কেমন গা?" ইত্যাকার নানারকম কথা কাণে কাণে চলিতে লাগিল। শেষে ১নং আগন্তুক সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ নীরদা! সে বউ কোথা? আমরা কি একবার দেখ্‌তে পাই নি?"

নীরদা। বাবা, সে কোথা, আমি কি জানি? আর জান্‌লেও বা আমি কি বল্‌তে পারি?

নীরদা ইঙ্গিতে জানাইল, তার সব জানা আছে। এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে নীরদাকে ডাকায় "যাই গো, আবার কি ফরমাস্‌ আছে" বলিয়া নীরদা প্রস্থান করিল। আগন্তুকগণ অনুসন্ধিৎসার অগাধ জলে পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল।

তখন আগন্তুকদের মধ্যে লীলা সম্বন্ধে নানা রকম তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "বউটার রঙ কাঁচা সোনার মত।" কেহ বলিল, "মুখখানা গোলাল-গোলাল, হাত পা যেন মোমের বাত্তি।" কেহ বলিল, "বড় মানুষের বউ, গায়ে ৩০০০৲ টাকার গহনা আছে।" তখন তাহাদের মধ্যে একজন জোর করিয়া বলিল, "তোরা সব জানিস্‌, আমি আজ নিজের চোকে দেখিয়াছি, আমি আসায় সে আমাকে দেখিয়া কপাট দিয়াছিল। নীরদা সেখানে ছিল। আমার চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিবার যো নাই, আমি এক দেখাতেই তাকে চিনিয়াছি।"

তখন আর একজন বলিল, "তবেই তুমি ঠিক দেখিয়াছ! আমিত তোমার সঙ্গে আসিতেছিলাম। তোমাকে দেখে যে কপাট দিয়াছিল বলিতেছ, সে ওদের রাঁধুনির ভাইঝী, সবে আসিয়াছে; আর তোমাকে দেখে সে ত কপাট দেয় নাই। হারা চাকর আসিতেছিল দেখিয়া কপাট দেয়।"

নানারকম তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় আবার নীরদা কার্য্যব্যপদেশে সেখানে আসিয়া বলিয়া গেল,—"আঃ ভগবান্ রক্ষে করেছেন; আর ভয় নাই, ক্ষীরোদ ডাক্তার বলেছে যে, জ্বর মগ্ন হ'বার সময়, যে সময়টা নাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ছিল, সে সময়টা কেটে গেছে; তবে শুধ্‌রে উঠতে দু-চার দিন দেরি লাগ্‌বে।"

আগন্তুক মধ্যে দু-চার জন একটু দুঃখিত হইল। যে দু-মাগী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মাসহারাটা বজায় রাখিবার চেষ্টায় আসিয়াছিল, তাহারা আর কিছুদিন মাসহারা ভোগ করিবে বলিয়া আনন্দিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কথার স্রোত বদলাইয়া

গেল. ক্ষীরোদ ডাক্তারের হাতযশ, নাড়ীজ্ঞান প্রভৃতির প্রশংসা হইতে লাগিল। ক্রমে আগন্তুকের দল সু-খবর পাইয়া যে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সে সেখানে প্রস্থান করিল।

নীরদা মিথ্যা বলে নাই, রোগিণীর উত্তরোত্তর সুলক্ষণ দেখা দিতে লাগিল ও তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে লাগিলেন।

আমরা ডাক্তার কবিরাজ নই, সুতরাং রোগ চিনিতে পারি না; যে রকম দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বড় ভয় হইয়াছিল; ভাবিয়াছিলাম, এ যাত্রা হৈমবতী আর রক্ষা পাইবে না। আর পাঠকবর্গেরাও মনে করিয়াছিলেন যে, হৈমবতী বুঝি তাহাদের দেখা দিয়াই পলাইবেন। কিন্তু কি করি? বিধাতার ইচ্ছা, ক্ষীরোদ ডাক্তারের হাত-যশ, আর নীলরতনের কপাল; হৈমবতী এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।
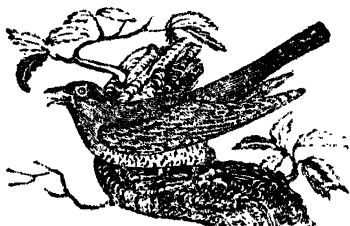
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ উপায়।

হৈমবতী ত বাঁচিয়া গেলেন। নীলরতন কিন্তু তাঁহার জ্বালায় মর-মর হইতে লাগিল। যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, হৈমবতী প্রতিনিয়ত নীলরতনকে লীলাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। সেই একঘেয়ে "ফিরাইয়া দাও" "ফিরাইয়া দাও" শুনিতে শুনিতে নীলরতন জ্বালাতন হইয়াছিলেন। এক একবার মনে করিতেন, তিনি আর অন্দর মহলে যাইবেন না, তবে আবার হৈমবতী, তাহার এই অসুস্থ শরীরে, না জানি কি করিয়া বসে, এই ভয়ে নীলরতনকে অন্দরে যাইতে হইত। হৈমবতী বলিতেন, "লীলাকে পাঠাইয়া দাও।" নীলরতন উত্তর দিতেন, "দাঁড়াও, ঠিক করি, না হয় দু-দিন পরেই পাঠাইলাম; শীঘ্রই মোকদ্দমা মিটিয়া যাইবে। আর পাঠাইলে যদি না লয়?" হৈমবতী বলিতেন, "তবে আজ আমি রাখিয়া আসি।" নীলরতন বলিতেন, "আমি না বুঝিয়া দেরি করি নাই, মোকদ্দমার যেরূপ গতিক দেখিতেছি,

তুমি আজ জোর করিয়া রাখিয়া আসিলে কাল আমায় জেলে যাইতে হইবে।” হৈমবতী নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া নিরস্ত হইলেন, কিন্তু তখনই আবার অন্য কোন উপায়ে পাঠাইতে বলিতেন। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হইত, যেমন করিয়াই হউক না কেন, লীলা কাল যাইবে। এমনি কাল কাল করিয়া অনেক দিন গত হইয়াছিল। নীলরতন যে, একেবারে আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে তাঁহার অঙ্গীকার পালনের কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। আর, হৈমবতীর আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গীকার পালন করাটার বিষয় একটু শৈথিল্য করিতেছিলেন।

এদিকে আমাদের যে সব গৃহলক্ষ্মী অসুখের সময় হৈমবতীকে দেখিতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লীলা সম্বন্ধে যাহার যাহা মনে হইল, রটাইয়া দিল। তবে তাহাদের সকলের মধ্যে একটা কথার ঐক্য ছিল। তাহারা সকলেই বলিয়াছিল যে, তাহারা লীলাকে দেখিয়া আসিয়াছে। দু-দিনের মধ্যে লীলা-সম্বন্ধে জনরব শতমুখে ছুটিয়াছিল। হাটে, মাঠে, বাজারে যেখানে নিষ্কর্ম্মার দল জড় হইত, তাহাদের মধ্যে লীলা ছাড়া অন্য কথা হইত না। এমন কি, নীলরতনের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কেহ কেহ একটু উঁকি মারিয়া যাইত। আশা, যদি সেই সময় ছাদের আলিসার মধ্য দিয়া লীলার মুখখানি দেখিতে পায়। তা যাহাই হউক, লীলাসম্পর্কীয় জনরবে নীলরতনের দুর্ভাগ্য বশতঃ একটু সত্য ছিল। লীলা বাস্তবিক নীলরতনের ঘরে ছিলেন।

এদিকে গ্রামের মধ্যে ধীরে ধীরে নীলরতনের বিরুদ্ধে একটী দল সৃষ্টি হইতেছিল। নীলরতন অনেক সময় অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ছিল, ক্ষমতা ছিল, প্রভুত্ব ছিল, তাই সাহস করিয়া কেহ তাঁহাকে এক কথাও বলিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে কাণাঘুষামাত্র চলিয়াছিল। কিন্তু সেই কাণাঘুষা ক্রমে স্পষ্ট বিরোধিতায় দাঁড়াইল। বিরোধিদলের যে সব লোক আগে তাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইত, আজ কাল তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইত না। নীলরতন যে বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নহে, তবে যেন ইচ্ছা করিয়া দেখিয়াও দেখিতেন না। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গোপাল মুকুয্যে এই দলের নেতা ছিলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নীলরতন ঠিক করিয়াছিলেন, এবার মোকদ্দমা না মিটাইতে পারিলে সুরাহা হইবে না। তখন অনেক বাছিয়া বাছিয়া একজন সুচতুর লোককে মৎলব বুঝিবার জন্য লীলার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মোকদ্দমা মিটাইবার আশা বৃথা; লীলার শ্বশুর বলেন, এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লীলাকে লইয়া যে তাঁহারা আর ঘর করিতে পারিবেন, এমন আশা করেন না; সুতরাং তাঁহারা এখন আর লীলাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। তবে যাহারা এমন অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য লীলার শ্বশুরদের সমধিক যত্ন; ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন।" কথা শুনিয়া নীলরতন লোকটীকে "কোন কাজের লোক নও" ইত্যাকার অনেক

ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সে কিন্তু, কথা শুনিতে শুনিতে নীল-রতন বাবুর মুখ শুকাইতে দেখিয়াছিল।

তখন নীলরতন আর এক চাল চালিলেন। সেই লোকটীকে আবার হেমন্তকুমারের বাড়ী পাঠাইলেন। হেমন্ত-কুমারের তাদৃশ বিষয় ছিল না, বিশেষ মোকদ্দমার সূত্রপাতেই লীলার শ্বশুর হেমন্তকুমারকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কাজ তাঁহার অনভিমতে করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং লোকটীর কথা শুনিয়া হেমন্তকুমার লীলার শ্বশুরের মত জানিতে গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, লীলার শ্বশুর এখন মোকদ্দমা আদালত হইতে না মিটিলে লীলাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন; সুতরাং আমি নিজে তাঁহার অনভিমতে কোন কাজ করিতে পারি না। তাঁহার অনভিমতে কার্য্য করিলে হয়ত আমার লীলা চিরদুঃখিনী হইবে। লোক ফিরিয়া আসিল। নীলরতন দেখিলেন, এ চালও ব্যর্থ হইয়াছে।

তখন হৈমবতী আবার ডাকিয়া পাঠাইলে নীলরতন যেমন যেমন করিয়াছিলেন, সব বলিলেন। শুনিয়া হৈমবতী বলিলেন, "আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?"

হৈমবতী বলিলেন, "যে রূপে ভুবন ভোলে, সে রূপে কি আর একজন ভুলিবে না?"

নীলরতন বলিলেন, "ভুলিবে না কেন? কিন্তু সে আর একজন কে?"

হৈমবতী বলিলেন, "অমূল্যকুমার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর-গৃহ।

লীলা নীলরতনের অন্দরে রহিয়া গেলেন। পাঠক মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, আমরাও প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ওখানে বুঝি লীলাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারিবেন না, বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লীলা আধখানা হইয়া যাইবে! বুঝি তাহার গণ্ডস্থলের হাড় বাহির হইয়া পড়িবে! চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিবে! তাহার কাঁচাসোণার রঙ কালি হইয়া যাইবে; বুঝি এই কয় দিনেই তাহার বালিকা-স্বভাব ঘুচিয়া যাইবে! বুঝি এক কথায়, লীলা আর সে লীলা থাকিবে না!

আমরা কিন্তু সব সময় যা মনে করি, তা ঘটে না; এখানেও তাই হইয়াছে। বারুণীর মেলায় যে লীলাকে দেখিয়াছিলাম, আজ হৈমবতীর কাছেও সেই লীলাকে দেখিতেছি। আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈষম্য বিশেষ লক্ষ্য না করিলে বোঝা যায় না। লীলা যে তাহার পিতৃগৃহের কথা, তাহার ঠাকুরমার ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; তবে হৈমবতীর স্নেহ ভালবাসা অনেক পরিমাণে তাহার শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিয়াছে। যেদিন—সে বিপদ, সঙ্কুল দিনের কথা মনে করিলে এখন ও লীলার আসাকে ধন্য

যেদিন অপরিচিত লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা বারুণীর মেলা হইতে অপরিচিত স্থানে আসে, সে দিন হৈমবতীর প্রথম সান্ত্বনা-বাক্যে লীলার ক্ষুদ্র হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তার পর হৈমবতী আশার মন্ত্র লীলার কাণে দিয়াছিলেন; শেষে হৈমবতী তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লীলা কিছুই ভোলে নাই, তবে তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল।

লীলা হৈমবতীর ঘরে একটা কাকাতুয়ার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছিল, যতবার তাহার গায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, ততবার কাকাতুয়া মাথার ঝুঁট ফুলাইয়া, চক্ষু রাঙ্গা করিয়া, গায়ের পালক উঠাইয়া, লীলাকে কামড়াইতে আসিতেছিল; শেষে লীলা অনন্যোপায় হইয়া কাকাতুয়াকে খাবার দিয়া গায় হাত দিতে যাইতেছিল, কাকাতুয়া কিন্তু খাবার লইবার পর আর গায়ে হাত দিতে দিতেছিল না। কাকাতুয়া যখন খাইতেছিল, লীলা তখন পিছন দিক হইতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। কাকাতুয়া কামড়াইতে আসিলে লীলা সরিয়া গিয়া হাসিতেছিল ও কাকাতুয়াকে অক্ষম বলিয়া উপহাস করিতেছিল; কাকাতুয়া লীলার কথা অত বুঝিতে পারিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সেও নিজের ভাষায় লীলাকে গালি দিতেছিল।

পিছন হইতে হৈমবতী লীলার কাকাতুয়ার সঙ্গে ঝগড়া দেখিতেছিলেন, একবার আর একটু হইলে কাকাতুয়া লীলাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল, তখন হৈমবতী ডাকিলেন, "লীলা!"

লীলা হৈমবতীর কাছে দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, আমি কবে যাব ব'ল না?"

হৈমবতী বলিলেন, "বলিতেছি, কিন্তু ও কাকাতুয়ার সঙ্গে কি হইতেছিল? এ যে কামড়াইলে একেবারে মাংস তুলিয়া লইত?"

লীলা উত্তর দিল, "তা বৈকি? তুমি গায়ে হাত দিলে ও কিছু বলে না, আমি গেলে কামড়াইতে আসে কেন? তা আমি একবার দেখাইব।" তখনই আবার লীলা বলিল, "হাঁগা, কৈ—কবে যাব বলিলে না?"

হৈমবতী দেখিলেন যে, লীলাকে যাবার সম্বন্ধে একটা জবাব না দিলে সে ছাড়িবে না। তখন হৈমবতী বলিলেন, "যাবে বৈ কি, কিন্তু যতদিন তোমার আর আমার অদৃষ্টের ভোগ না ফুরায়, ততদিন এখানে থাকিতে হইবে।"

হরি হরি! লীলার আবার অদৃষ্টের ভোগ! অমন সুন্দর মুখ যাহার, তাহার অদৃষ্টে দুঃখ! যেদিন লীলাকে প্রথম বারুণী মেলায় দেখিয়াছিলাম, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম, না জানি, এই বালিকার ভবিষ্যৎ কতই সুখময় হইবে। বিধাতা তাঁহার এমন সুন্দর সৃষ্টিকে কি কাঁদাইতে পাঠাইয়াছেন! লীলার পিতা মাতাও লীলার শৈশবে বলাবলি করিতেন, আমাদের লীলার জন্য কখন ভাবিতে হইবে না। এ রূপলাবণ্য বৃথায় আসে নাই। লীলার অদৃষ্টে কখন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। লীলার নিশ্চয় সৎপাত্রে বিবাহ হইবে। ফলে হইয়াছিলও তাহাই। লীলা বিবাহের বয়সে পা দিতে-না-দিতেই তাহার জন্য ঘটক ছুটাছুটি করিয়াছিল। হেমন্তকুমার নিঃস্ব হইলেও লীলার জন্য রাশি রাশি পাত্র জুটিয়াছিল। হেমন্তকুমার তাহাদেরই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সৎপাত্র দেখিয়া অমূল্যকুমারের হস্তে লীলাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের পর এক

বৎসর বড়ই আমোদ আহ্লাদে গিয়াছিল, তারপর এই লীলার অদৃষ্টে বারুণীর মেলা আর পাঠকের আমার উপর রাগ!

রাগ বৈকি! রাগের কাজ করিলে রাগের পাত্র হইতে হয় না ত কি? কোথায় আমি অমন সুন্দরী মেয়েকে সোফার উপর এলোচুলে আধ-বসাইয়া আধ-শোয়াইয়া কার্পেট তুলিতে তুলিতে পাঠকের সামনে হাজির করিব, কোথায় তাহার সামনে একখানা নভেল, আর একটা গোলাপ ফুলের তোড়া, একটা পিয়ানো, না হয় একটা হারমোনিয়ম পড়িয়া থাকিবে, কোথায় মিহিসুরের আওয়াজে লীলা চাকর বাকরকে ডাকিবে; না আজ কোথায় অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে লীলার দিন কাটিতেছে—ভাল, তাই না হয় হইল, লীলার অন্তত ঘন ঘন মূর্চ্ছাটাও হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কৈ, পাঠকবর্গকে তাহাও ত দেখাইতে পারিতেছি না! অবশ্য আমি একটা ইহার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। কৈফিয়ৎ আর নিজে কি দিব? পাঠকবর্গ! বিধাতার নিকট হইতে লইবেন; তাঁহার সৃষ্টির ভিতর যে এত অনাসৃষ্টি আছে, তা আমি জানিতাম না। আর জানিলে, এত করিয়া লীলার কোথায় কি হইয়াছিল, খুঁজিয়া বেড়াইতাম না, আর পাঠক মহাশয়েরও বিরক্তিভাজন হইতাম না।

কি বলিতেছিলাম!—লীলা হৈমবতীর কথায় মুখ তুলিয়া, হৈমবতীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার ডাগর ডাগর চোক দুটী একটু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জানি, আমার অদৃষ্টের ভোগ না ফুরাইলে আমার যাওয়া হইবে না, কিন্তু আমার যাওয়ার সঙ্গে তোমার অদৃষ্টের সম্বন্ধ কিসের?"

লীলা বাস্তবিকই বুঝিতে পারে নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সময় তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সরলতা, কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব শোভা পাইতেছিল। তখন হৈমবতী সযত্নে লীলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখখানি দুই হাত দিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পার নাই! লীলা, বুঝিবে কেমন করিয়া? স্বামী কি পদার্থ, এখনও জানিতে পার নাই; আর তাই স্বামীর অদৃষ্টের সঙ্গে স্ত্রীর অদৃষ্ট কি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। যতদূর শুনিয়াছি, যতদূর জানিয়াছি, তোমাকে আনিয়াছেন বলিয়া বা আমার স্বামীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে! সেই সঙ্গে আমারও ভাগ্য বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।"

লীলার জন্য হৈমবতীর ভাগ্যবিপর্য্যয়! যে হৈমবতী লীলাকে তেমন বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহার জন্য যে হৈমবতী প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন, যে হৈমবতী আজও লীলাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন, লীলার জন্য তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে? লীলা ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। লীলা কাঁদে কাঁদুক, তাহার জন্য অপরে কাঁদিবে কেন? আর লীলা মরিলে যদি সকলে সুখী হয়, তবে লীলা না হয় মরিল। তখন সেই ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞ হৃদয় আপনার মৃত্যু কামনা করিল। লীলার ডাগর ডাকর চোক দুটী জলে পূরিয়া আসিল, হৈমবতীর দুটী হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া লীলা বলিল, "লীলা মরিলে যদি সকলের অদৃষ্টের ভোগ ফুরায়, তবে লীলা মরুক না কেন?"

কি জানি, কেমন করিয়া হৈমবতী লীলার সেই জলভরা চোক দুটী দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর তেমনি করিয়া, ঠাকুরমার মত

করিয়া মুছাইয়া দিয়াছিলেন। লীলার চোক দুটো বড় অবাধ্য। মানা না শুনিয়া বড় কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল। তা করুক, লীলার কথা শুনিয়া হৈমবতীরও চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল।

হৈমবতী লীলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "না লীলা, লীলাকে মরিতে হইবে না, অমূল্যকুমার বাঁচিয়া থাক্, এ রত্ন তাহার পায় ফেলিয়া দিলে সে কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না; দেখি অমূল্যকুমারকে বলিয়া সব মিটাইতে পারি কি না?"

অমূল্যকুমারের নাম শুনিয়া লীলা লজ্জায় মুখ নামাইল। তখন সেই লজ্জাবনত মুখখানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল। আর সেই লজ্জায়-অর্দ্ধমুদিত সেই ভাসা-ভাসা চোক দুটি,—থাক, লীলা পরের স্ত্রী, অত শত কথায় আমাদের কাজ নাই।

তখন হৈমবতী বলিলেন, "অমূল্যকুমার আসিলে তাহার কাছে যাইতে পারিবে ত? যে যে কথা বলিয়া দিব, বলিতে পারিবে ত?"

অমূল্যকুমারের সহিত বিবাহ হওয়া অবধি রাজ্যশুদ্ধ লোক "অমূল্যকুমার—অমূল্যকুমার" করিয়া লীলাকে ক্ষেপাইয়া মারিয়াছে, বিশেষ ঠাকুর মা। আজ এখানে পরের বাটীতেও সেই অমূল্যকুমার! লীলা হৈমবতীর কথায় জবাব না দিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, হৈমবতী টানিয়া রাখিলে লীলা তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া হাতে আঁচড়াইয়া পলাইল।

হৈমবতী কিন্তু অমূল্যকুমারকে লইয়া কি একটা মৎলব আঁটিতেছিলেন, তা লীলা যখন তাঁহার কথায় কাণ দিল না, আমরাও তাঁহার মৎলবটা শুনিতে পাইলাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বামী সন্দর্শনে।

তা হৈমবতী ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদিন অমূল্যকুমার মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি একটা পরামর্শ করিতে, গোপাল মুকুর্য্যের বাড়ী আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া যাইবার সময় নীরদা কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদা বাবু!"

অমূল্যকুমার সবিস্ময়ে দেখিলেন, সম্মুখে একটা স্ত্রীলোক তাঁহাকে 'দাদা বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। অমূল্যকুমার বলিলেন, "কে তুমি? আমি ত তোমায় চিনি না; তুমি লোক ভুল করিয়াছ বোধ হয়।"

নীরদা। আমি লোক ভুল করি নাই। কেমন করিয়া চিনিলাম, পরে বলিব। সম্প্রতি লীলার নিকট হইতে আসিতেছি, লীলা আপনাকে ডাকিতেছেন।

অমূল্যকুমার ভাবিলেন, আবার একটা কি বিপদ! লীলার নাম করিয়া আবার একটা কে তাঁহাকে নূতন ফ্যাসাদে ফেলি-

বার চেষ্টা করিতেছে। তখন বিশেষরূপে নীরদাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, শঠতা বা প্রবঞ্চনার লেশমাত্র তাহাতে দেখিতে পাইলেন না।

ভাব বুঝিয়া নীরদা বলিল, "কি দেখিতেছেন?—বিশ্বাস করিতে পারেন না?"

অমূল্য। এখন যেরূপ সময়, বিশ্বাস করিতে পারি না।

নীরদা। আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলি নাই, আমি চলিলাম। লীলাকে বলিব, অমূল্যকুমার আসিলেন না।

নীরদা ফিরিল।

অমূল্যকুমারের শরীরে কি একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতেছিল। লীলা অমূল্যকুমারের জাগ্রত অবস্থায় আরাধনার ধন, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মোহিনী প্রতিমা; লীলা অমূল্যকুমারের মর্ত্ত্যের স্বর্গ, স্বর্গের অস্পৃশ্য কুসুম,—অমূল্যকুমার লীলাকে ছুঁইতে সাহস করেন না, পাছে নিশ্বাসে শুকাইয়া যায়। সেই লীলা ডাকিতেছে, আর অমূল্যকুমার যাইবেন না?

নীরদা ফিরিয়াছিল বটে, কিন্তু বড় চলিতে পারিতেছিল না। পথের ঘাসগুলা উঁচু উঁচু হইয়া তাহার পায়ে বিঁধিতেছিল; কি জানি, কিন্তু আসিবার সময় ত এমন করিয়া বিঁধে নাই।

অমূল্যকুমার অল্প আয়াসেই নীরদাকে ধরিলেন। নীরদা বলিল, "আবার কি?"

অমূল্য। সত্য সত্যই কি লীলা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? লীলা কোথায়?

নীরদা। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যখন আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তখন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

অমূল্য। তা জানি, কিন্তু যখন তোমাকেই চিনি না, তখন লীলা কোথায় আছে, জানিয়া যাইতে দোষ কি?

নীরদা দেখিল, বড় বিপদ, যদি সত্য কথা বলি, তবে ত অমূল্যকুমার কোন মতেই যাইবেন না। এখন নীলরতনের সঙ্গে অমূল্যকুমারের যেরূপ ঘোরতর শক্রতা, অমূল্যকুমার নিতান্তই মূর্খ না হইলে আর নীলরতনের বাড়ী পা বাড়াইবেন না। তখন নীরদা কৌশল করিয়া বলিল, "যেখানে লীলা আছেন, বলিতে নিষেধ আছে। আপনার ইচ্ছা ও বিশ্বাস যদি হয়, ত আমার সঙ্গে আসুন।"

অমূল্যকুমার নিতান্ত ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, নীরদাও এতক্ষণ অমূল্যকুমারকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল; শেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া নীরদা বলিল, "হাঁ, বলিতে ভুলিয়াছিলাম. লীলা আপনাকে কি একখানি চিঠি দিয়াছেন।" নীরদা আঁচলের খোঁট হইতে খুলিয়া কি একটা কাগজ অমূল্যকে দিল। অমূল্যকুমার তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন, সেই লীলার হাতের অক্ষর, সেই হিজি-বিজি কালি-ফেলা, পড়া-যায়-না চিঠি, সেই এক ছত্র লিখিতে পাঁচ ছত্র কাটা, আর সেই একটা ছত্রে পাঁচটা ভুল, সেই আঙ্গুল দিয়া মোছা কালির দাগ, আর সেই কাগজের এ-কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করা ছত্র। তখন অমূল্যকুমার বলিলেন, "তুমি যে লীলার নিকট হইতে আসিতেছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন তুমি যেই হও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।" অমূল্যকুমার অনেক কষ্টে পড়িলেন, লীলা তাঁহাকে পত্রবাহকের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নীরদা অমূল্যকুমারকে লইয়া একেবারে নীলরতনের অন্দরে যেখানে লীলা বসিয়াছিল, সেইখানে হাজির করিল। অমূল্য নীলরতনের দরজায় পা দিতে একবার ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু নীরদা পুনঃ পুনঃ লীলালাভের লোভ দেখাইয়া, প্রায় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

লীলা অমূল্যকুমারকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। তখন নীরদা কত টানাটানি, কত সাধা-সাধি করিয়া লীলাকে অমূল্যকুমারের কাছে রাখিয়া গেল।

অমূল্যকুমারের চোকের সাম্‌নে কি একটা স্বপ্নের মতন ভাসিয়া যাইতেছিল। আজ আবার কত দিনের পর সেই অতুল রূপের অধিষ্ঠাত্রী লীলা তাঁহার সম্মুখে। অমূল্যকুমার দেখিতেছিলেন, লীলার সেই জলন্ত অথচ স্নিগ্ধ তরল রূপ-রশ্মি তেমনিই আছে। সেই লজ্জাবনত মুখখানি, সেই অযত্ন-বিন্যস্ত চরণ-চুম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই আল্‌তা-মাখান ঠোঁট দুখানি, সেই অর্দ্ধমুদ্রিত ভুরু-ন্যস্ত আকর্ণ-বিশ্রান্ত চোক দুটী, সেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিদ্যুদ্দাম-বিলোল কটাক্ষ, সেই কনককান্তি, সেই পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও 'নয়ন-না-তিরপিত ভেল' রূপের সমন্বয়, সব তেমনি-ই আছে। আর তেমনিই আছে, সেই রূপের অনন্ত লহরী-লীলা, সেই বায়ু-বিতাড়িত অলকদামের খেলা, আর সেই কনক-চম্পক-কলিনিভ অঙ্গুলি-সঞ্চালন, সেই প্রশান্ত ললাটের স্বেদ-বিন্দু। অমূল্যকুমার মন্ত্রমুগ্ধ—অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিলেন। সে দেখার আর বিরাম নাই, সে চক্ষের পলক নাই, সে দেখিবার আশার তৃপ্তি নাই। অমূল্য-কুমারের শরীরে মন ছিল না, মনে জ্ঞান ছিল না, জ্ঞানে সংজ্ঞা

ছিল না। কে বর্ণন করিবে, তাঁহার সেই তন্ময় ভাব? কোথায় তুমি রূপের উপাসক! শিখাইয়া দাও, কেমন করিয়া বর্ণন করিতে হয়—রূপের নীরব নিস্তব্ধ তন্ময় উপাসনা! আর তুমি পূর্ণসুন্দর ঈশ্বরের সুন্দর প্রতিচ্ছায়া—রূপ! জগতের আনন্দ-রশ্মি! বলিয়া দাও, কি প্রভায় অমূল্যকুমারের নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিলে? নহিলে কে বর্ণনা করিবে?

অমূল্যকুমার নির্নিমিষ নয়নে লীলাকে দেখিতেছিলেন। আর লীলা—আমাদের ঠাকুরমার আদরের লীলা কি অমূল্য-কুমারের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল? লীলা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছিল, স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, তাই সে অমূল্য-কুমারকে প্রণাম করিত। স্বামীকে ভালবাসিতে হয়, তাই সে মনে করিত, অমূল্যকুমারকে ভালবাসে, কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, এখনও সে তাহা জানে না।

কতক্ষণ দুজনে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, অমূল্যকুমারের মনে যাহাই হউক, লীলার কিন্তু অত ভাল লাগিতেছিল না; সে হৈমবতীর কি একটা শিখানকথা বলিতে আসিয়াছিল, সেইটা বলিয়া পলাইতে পারিলেই তাহার অব্যাহতি হয়;—তাই সে সেই কথাটা বলি বলি করিতেছিল; তা লজ্জায় তাহার মুখে কথাটা বড় ফুটিল না, আধখানা পেটের ভিতরেই রহিয়া গেল। আর সেই ফোটে-ফোটে-ফোটে-না অস্ফুট হৃদয়ের ভাষা! অমূল্যকুমারের চমক ভাঙ্গিল। বিবাহ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত লীলা তাঁহাকে ডাকিয়া কথা কয় নাই, আজ সেই লীলা তাঁহাকে ডাকিয়া কথা বলিতেছে, অমূল্যকুমার অধীর হইলেন। লীলা আবার একবার তাঁহাকে কি একটা কথা 'হ-র-ব-র-র'

করিয়া জড়াইয়া বলিল; এবারও অমূল্যকুমার বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বড়ই সোহাগে, সাদরে, সযত্নে, লীলার হাত দুখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা! কেন লীলা আমায় ডাকাইয়াছ?" লীলাকে স্পর্শ করিয়া অমূল্যকুমার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া লীলাময় হইয়াছিলেন,—আর লীলা কোথায় সোহাগে গলিয়া যাইবে—না, ছি ছি! অমূল্যকুমারের হাত হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়াছিল।

তখন অনেক কষ্টকল্পনা করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া, লীলা বলিলেন, "হাত ছাড়িয়া দাও। আর মোকর্দ্দমায় যাহাই হউক না কেন, নীলরতনকে বাঁচাইতে হইবে।"

হরি হরি! এ কি কথা! এই বলিবার জন্য লীলা অমূল্যকুমারকে ডাকাইয়াছিলেন! আর এই কথা শুনিবার জন্য অমূল্যকুমারের এত আগ্রহ; নীলরতনকে পাঁশ পাড়িয়া কাটিলে যে অমূল্যকুমারের রাগ যায় না, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য লীলার অনুরোধ! যে নরপিশাচ লীলাকে চিরদুঃখিনী করিতে বসিয়াছে, আর তাহার অধিক—যে রাক্ষস লীলার সর্ব্বস্ব ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারই ঘরে বসিয়া আজ লীলা তাহাকে বাঁচাইতে বলিতেছে! অমূল্যকুমারের চক্ষের সম্মুখ দিয়া নীলরতনের ঘরের দেওয়াল ঘুরিতে লাগিল। অমূল্যকুমার হাত দিয়া ঘরের মেজে ধরিলেন।

কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অমূল্যকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা!—বল লীলা! আজ কেন তোমার এ অনুরোধ? একবার বুঝাইয়া দাও,—অমূল্যকুমার তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবে না।"

লীলা অনেকক্ষণ হৈমবতীর নিকট হইতে আসিয়াছেন, এতক্ষণ না জানি, তাহারা কি মনে করিতেছে, আর তাহা ছাড়া, সে ত হৈমবতীর শিখানকথা বলিয়াছে—আর তাহার থাকিবার দরকার কি?—লীলা যাইবার জন্য উঠিতেছিল, তখন অমূল্যকুমার আবার ধরিয়া বসাইলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর লীলা আবার বলিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক আর কিছু জানি না, নীলরতনের যেন অনিষ্ট না হয়।" এই কথা বলিয়া, লীলা হাত ছাড়াইয়া পলাইল। অমূল্যকুমার আবার ঘরের মেজে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

লীলা ছুটিয়া গিয়া যেখানে হৈমবতী ও নীরদা ছিল, সেই-খানে উপস্থিত হইল। উভয়েই আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কেমন লীলা, ঠিক ত বলিতে পারিয়াছিলে?"

লীলা বলিলেন, "বুঝি, অত কথা সব বলিতে পারি নাই, তবে নীলরতনকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

হৈমবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিয়াছ?"

লীলা উত্তর দিলেন, "কৈ, আরত কিছু বলিতে বল নাই?"

হৈমবতী বলিলেন, "তবেই সব বলিয়াছ, আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ।"

নীরদার সেই সময় বুঝি লীলাকে একটা অন্তর-টিপ্‌নি দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তা না দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "নেকি?"

তা তোমরা যাই বল, আমাদের লীলা কি করিবে? সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় আপনার প্রাণকে উৎসর্গ করিয়া স্বামীর প্রাণে দাগা দিয়া নীলরতনকে বাঁচাইতে বলিয়া আসি-য়াছে। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, হৈমবতীর যত কিছু অনুরোধ

নীলরতনকে বাঁচাইবার জন্ত; যেন কোনমতে নীলরতনের পায়ে কাঁটাটী না ফোটে, কেবল এই কথাই তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল, আর এই কথাই সে অমূল্যকুমারকে বলিয়া আসিয়াছে। আর তাহাকে লইয়া যাওয়ার কথা? সেও কি একটা কথার মধ্যে? লীলার বিশ্বাস ছিল, সুবিধা পাইলেই অমূল্যকুমার, না হয় তাহার পিতা, তাহাকে লইয়া যাইবে। তাহার জন্ত কি আবার উপরোধ করিতে হয়! আর হইলেও না হয় হেমন্তকুমারকে সে এ কথাটা বলিতে পারিত। তা লজ্জার মাথা খাইয়া স্বামীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইতে বলিবে? সে কথা লীলার মুখে ফুটিল না। লীলা আমাদের সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারে নাই। সে হৈমবতীর কাছে কত ঋণী, আর সেই জন্ত—হৈমবতীর জন্ত—কেন নীলরতনকে বাঁচান দরকার, সে সব কথা লীলার মুখে ফোটে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি লীলার দোষ? কেমন করিয়া স্বামীর কাছে সোহাগ করিয়া নিজের কার্য্য উদ্ধার করিতে হয়, লীলা তাহা জানে না; কেমন করিয়া গলা ধরিয়া স্বামীর কাণে মন্ত্র দিয়া একান্নের সোণার সংসার নষ্ট করিতে হয়, লীলা তাহা শিখে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সে অকৃতজ্ঞ নহে। পৃথিবীর কুটিলতা লীলার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের অভাব ছিল না; কিন্তু তবুও কি তোমরা লীলার দোষ দিবে?

তা হোক, হৈমবতীর কথায়, নীরদার মুখের ভাব দেখিয়া লীলা ভাবিতেছিল, বুঝি সে হৈমবতীর কার্য্য করিয়া আসিতে পারে নাই। অভিমানে লীলার "পান্‌সে চোক" কি একটা

কাণ্ড বাধাইবার উপক্রম করিতেছিল। তখন লীলা সেই ডব-ডবে চোক লইয়া মুখ ফিরাইয়া নিজের কক্ষে পলাইল। সেখানে গিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া লীলা কত কাঁদিয়াছিল, তাহা সেই অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে দেখিবে? লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে যেথানে অমূল্যকুমার একেলা বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সংসারের ধ্রুবতারাকে অস্তমিত হইতে দেখিতেছিলেন, সেখানে নীরদা গিয়া উপস্থিত হইল। অমূল্যকুমার চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চল! প্রথমে নীরদাকে দেখিতে পান নাই। তখন নীরদা ডাকিল, "দাদা বাবু?"

অমূল্যকুমার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আবার কেন? এতদিন বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝিতে পারিতেছি; অন্ধ-কারেই বিদ্যুতের জন্ম। তাহার ক্ষণিক স্থায়িত্ব অন্ধকারকে দীপ্তিমান করিবার জন্য, উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য, তারপর অন্ধকারেই লয়। আজ এ যে সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে, অধে গাঢ় তিমির,—ভেদ করিয়া কোথায় যাইব? না, জীয়ন্তে এ যন্ত্রণা অসহ্য! আজ কেন লীলাকে দেখাইলে? না, তোমার দোষ নাই। চল, আজ সপ্তমীর পূর্ব্বে, উদ্বোধনের পূর্ব্বে, দেবীপ্রতিমা বিজয়ার জলে বিসর্জ্জন করি!" লীলা কেন তাহার স্বামীর পরম শত্রুর শুভানুধ্যায়িনী, অমূল্যকুমার তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না; তাই নানারূপ সন্দেহে তাঁহার মনে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতেছিল।

নীরদা বুঝি অমূল্যকুমারের অত কথা বুঝিতে পারিল না;

তাই বলিয়া উঠিল, "তা হবে তখন; এখন লীলাকে কবে লইয়া যাইবেন, ঠিক করিলেন।"

অমূল্যকুমার অনন্তমনে উত্তর দিলেন, "কবে লইয়া যাইব, বলিতে পারি না, তবে যখন সময় হইবে, লীলা আপনিই যাইবে।" অমূল্যকুমারের মন উদাস হইয়া আসিতেছিল। লীলার নামে তাঁহার প্রাণে বুঝি আর তেমন আকুলতরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয় না।

নীরদা আবার বলিল, "সে সময় ত হইয়াছে, মনে করিলে এখনই লইয়া যাইতে পারেন।"

অমূল্যকুমার মুখ তুলিলেন। বলিলেন, "আর দুই দণ্ড আগে ওই কথাটা শুনিবার জন্য বুঝি সর্ব্বস্ব দিতে পারিতাম। লীলা সংসারে আমার জীবনের বন্ধন-গ্রন্থি। আজ সেই গ্রন্থি শিথিল; বুঝি আর লীলাকে লইয়া যাইব না।"

নীরদা বলিল, "আচ্ছা, দেখিতে পাইব, অমন অনেকে বলিয়া থাকে।" নীরদা ভাবিতেছিল, একবার এই সময় লীলার সেই মুখখানি অমূল্যকুমারকে দেখাইতে পারি।

তা হোক, নীরদা না হয় দু-দিন পরে লীলার মুখখানি অমূল্যকুমারকে দেখাইবে, আর আমাদের লীলাও ত চিরকাল এমন বোকা থাকিবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নীরদা আবার বলিল, "তবে এখন?"

অমূল্যকুমার বলিলেন, "যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে।" অমূল্যকুমার উঠিলেন। নীরদা পথ দেখাইয়া দিল। শূন্যমনে অমূল্যকুমার নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

হৈমবতী ঠিক বলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের ভোগ না ফুরাইলে কষ্ট ফুরায় না।

নবম পরিচ্ছেদ।

মুকুয্যের বুদ্ধি।

গোবিন্দ ঘোষ হাজতে পচিতেছিলেন। সেই নিরীহ ভদ্র-লোকের দুর্দ্দশায় সমগ্র রায়পুরের লোক দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কারণে রায়পুরের প্রজারা গোবিন্দ ঘোষের বাধ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দায়-অদায় পড়িলে, সে ছুটিয়া গোবিন্দ ঘোষের নিকট উপস্থিত হইত। গোবিন্দ ঘোষও সাধ্যমত শরণাগতের বিপদ-মোচনে ত্রুটি করিতেন না। কাহারও সম্পত্তি নীলাম হইয়া যাইতেছে, সে আসিয়া গোবিন্দ ঘোষের নিকট টাকা ধার লইয়া তাহা রক্ষা করিত। কাহারও গৃহ দাহ হইয়াছে, সে গোবিন্দ ঘোষের নিকট হইতে বিনামূল্যে চাল ছাইবার খড় পাইত। কাহারও বীজধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর বীজের ধান নাই, সে গোবিন্দ ঘোষকে ধরিলে তাহার প্রার্থনা বিফল হইত না। কাহারও প্রতিবাসীর সঙ্গে মনান্তর হইয়াছে, সে গোবিন্দ ঘোষকে জানাইলে তিনি উভয় পক্ষকে ডাকিয়া সুন্দর মীমাংসা করিয়া

দিতেন। তাহা ছাড়া গোবিন্দ ঘোষের অন্দরে কৃষকপত্নীদের অবারিত দ্বার ছিল। একটী ছেলে কোলে করিয়া আর একটীর হাত ধরিয়া কৃষকপত্নীদের রাতদিন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর নিকট যাওয়া-আসা করিতে দেখা যাইত। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী ছাড়া তাহাদের দুঃখ জানাইবার আর কেহ ছিল না; বাড়ীর পার্শ্বের গৃহস্থেরা চা'লটা, তেলটুকু, নুনটুকুও দরকারমত লইয়া যাইত। তাহা ছাড়া রৌদ্রের সময় আসিলে কোন্ না একটু মিষ্টি ও এক ঘটী শীতল জল খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী আবার এক নিয়ম করিয়াছিলেন।—গ্রামের মধ্যে কোন বিবাহ হইলে নবদম্পতীকে আনিয়া এক জোড়া নূতন কাপড় না পরাইয়া ছাড়িতেন না। নবদম্পতীরও মনে হইত, বিবাহের পর গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী না গেলে বুঝি তাহাদের বিবাহ মঞ্জুর হইবে না। গোবিন্দ ঘোষ যদিও নিতান্ত নির্দ্ধন ছিলেন না, তথাপি নানা কারণে কখন কখন তাঁহার অতিরিক্ত খরচ হইয়া যাইত। কখন কথা উঠিলে বলিতেন, "আর টাকা লইয়া কি করিব? আমরা ত নিঃসন্তান, কাহারও জন্য ভাবিতে হয় না; তবে এ জন্মে টাকার সদ্ব্যয় করা আর জন্মের জন্য ভগবান্‌কে টাকা ধার দেওয়া বৈত নয়! তা না হয় ধারই দিলাম।" আজ সেই গোবিন্দ ঘোষের হাজত হওয়াতে রায়-পুরের সরলপ্রাণ কৃষকমাত্রেই ব্যথিত।

নফর যে এ মোকর্দ্দমায় সংশ্লিষ্ট, তাহা দুই দিনের মধ্যে রায়পুরের প্রজাদের আর জানিতে বাকি রহিল না। প্রথমে নফরকে ভাঙ্গাইতে তাহারা অনেকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, অনেক লোভ দেখাইয়াছিল; কিন্তু নফর যখন কোন

মতেই টলিল না, তখন তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। নফর গ্রামের বাজারে গেলে জিনিস-পত্র খরিদ করিতে পাইত না। তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ হইয়াছিল, রাত্রে অলক্ষ্যে তাহার চালে ঢিলটা-আস্‌টা আসিয়া পড়িত; বড়ই বেগতিক দেখিয়া নফর গ্রাম ছাড়িয়া নীলরতনের অধিকারে আসিয়া বাস করিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও তাহার নির্যাতনের শেষ হয় নাই। রায়পুরের লোকেরা গোপনে মুকুয্যের কাছে আনা-গোনা আরম্ভ করিয়াছিল, নফরের সঙ্গে দেখা হইলে, সময় ও সুবিধা পাইলে তাহারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে ছাড়িত না; কিছু না পারিলেও অন্তত পিতৃ-পিতামহের জন্য সুশ্রাব্য ভাষায় উত্তম খাদ্যের বন্দোবস্ত বরিয়া আসিত। অবশ্য এ সব কথার নালিশ যে নীলরতনের কাছে হয় নাই, তাহা নহে; তবে ইদানীং তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না—তাঁহার বিপক্ষদলেরা শনৈঃ শনৈঃ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

এদিকে গোবিন্দ ঘোষ হাজতে পানাহার বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম দুই দিন ত অনশনেই ছিলেন, তাহার পর কেবল জেলে দারোগার নির্ব্বন্ধে একমুষ্টি আহার করিতেন। ব্যাপার শুনিয়া দারোগার বড় দয়া হয়; তাই তিনি লুকাইয়া ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন আনিয়া দিতেন। তাহারই একমুষ্টি আহার করিয়া গোবিন্দ ঘোষের দিনপাত হইত। আর সমস্ত দিন তিনি ভগবানের নাম করিয়া কাটাইতেন। এই কয় দিনেই গোবিন্দ ঘোষের অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিলে হঠাৎ চেনা যাইত না।

অমূল্যকুমারের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে মুকুয্যে মশাইকে এ

মোকদ্দমারও তদ্বির করিতে হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তিনি বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দু-একটা ভাড়া-করা পেশাদার ঘুষখোর বদ্‌বলে সাক্ষী ভাঙ্গাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আসল সাক্ষীরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বড় আমল দেয় নাই। নফরের পিছনে গুপ্ত অনুসন্ধানের জন্য লোক লাগাইয়াছিলেন; তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন যে, মোকদ্দমার সূত্রপাত হইতে সে তিনকড়ি সেকরার কাছে যাওয়া-আসা করে। তিনকড়ি প্রসিদ্ধ চোরাই মালের গ্রাহক, কয়েকবার শ্রীঘরেও বাস করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার স্বভাব সংশোধন হয় নাই। সেই তিনকড়ির সঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই বড় সন্দেহের কথা। ইহার একটা কারণ মুকুয্যে মশাই ঠাওরাইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক না জানিতে পারায় কাহাকেও কিছু বলেন নাই। আজ সনাতনকে সেই সম্বন্ধে কি একটা বিষয় জানিতে পাঠাইয়া মুকুয্যে মশাই বড়ই উৎসুকচিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সনাতন বড়ই বিশ্বাসী ও চতুর। একবার তাহার স্ত্রীর ওলাউঠা হইলে গোবিন্দ ঘোষ, ভিন্ন গ্রাম হইতে ডাক্তার আনাইয়া অনেক খরচ করিয়া তাহার স্ত্রীকে বাঁচাইয়াছিলেন, সেই অবধি সে গোবিন্দ ঘোষের কেনা গোলাম হইয়াছিল। মোকদ্দমা হওয়া অবধি সে নিজের শরীর ঢালিয়া পরিশ্রম করিতেছিল। সনাতনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সে গোবিন্দ ঘোষকে এই মিথ্যা মোকদ্দমা হইতে খালাস করিয়া আনিতে পারিবে। সেই বিশ্বাসের জন্যই হউক, কি নিজের কৃতজ্ঞতার জন্যই হউক, সনাতন একদিনের তরে মুকুয্যে মশাইয়ের হুকুম পালন করিতে

দ্বিধা করে নাই। আর সেই জন্যই আজও সনাতনকে মুকুয্যে মশাই তথ্য-সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এদিকে হুঁকা হাতে মুকুয্যে মশাই তাঁহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় পাইচালি করিতেছিলেন। ক্রমে যতই দেরি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার পাদ-চারণের বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেবল ফিরিবার সময় এক একবার মুখ তুলিয়া যেখান হইতে রাস্তাটি সোজা নজর হয়, সেইখান হইতে একদৃষ্টে রাস্তার শেষভাগ পর্য্যন্ত দেখিতেছিলেন। আঃ! এখনও সনাতন ফিরিল না! মুকুয্যে মশাই সবেগে তামাক পোড়াইতেছিলেন, আর মনে মনে কতই তোলাপাড়া করিতেছিলেন। আচ্ছা, তিনি যাহা আন্দাজ করিয়াছেন, তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে ত একেবারেই গোবিন্দ ঘোষ আর সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যকুমার খালাস! তারপর নফরটাকে টানিয়া জেলে পুরিবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নীলরতনের শ্রাদ্ধও বেশ গড়াইবে! আর যদি তাঁহার আন্দাজ মিথ্যা হয়, তবে গোবিন্দ ঘোষকে রক্ষা করে কাহার সাধ্য? মুকুয্যে মশায় শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার তামাক টানা বন্ধ হইল; মুখ হইতে হুঁকা নামিয়া হাতে ঝুলিয়া পড়িল।

তবু সেই ঝুলান-হুঁকা-হাতে মুকুয্যে মশাইয়ের পাইচালির বেগ কমিল না, এখন আবার তিনি-কি বিড়-বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় দূর হইতে সন্ধ্যার আবছায়ায় ঢাকা হইয়া, সনাতনের সজীব কৃষ্ণোজ্জ্বল কান্তি দেখা দিল। মুকুয্যে মশাই বড়ই অধীর হইয়াছিলেন, পা উঁচু করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন, তাই ত, সনাতনই ত আসি-

তেছে। মুকুয্যে মহাশয়ের পাইচালি বন্ধ হইল। আবার হুঁকা হাতে উঠিল, আবার কলিকা হইতে নলিচার মধ্য দিয়া হুঁকার জলে অবগাহন করিয়া, সুবাসিত তামাকের ধূম তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় আসিতে লাগিল।

সনাতন পৌঁছিতে-না-পৌছিতে তাহাকে প্রণাম করিতে অবসর না দিয়াই, মুকুয্যে মশাই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সনাতনের আর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা হইল না, হাত দুটা কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "প্রণাম! খপর ভাল, আপনি যাহা আঁচ করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। যেদিন লীলাকে চুরি করা হয়, তাহারই পরদিন হইতে নফর ও তিনকড়ির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আর লীলাচুরি হইবার আট দিন পরে, পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর গহনার বাক্স হইতে আংটী পায়।"

"সাবাস" বলিয়া মুকুয্যে মশাই একদমে কলিকার বাকি তামাকটুকু পোড়াইয়া ছাই করিয়া, সনাতনের মুখের সামনে ধূম ছাড়িয়া দিলেন। সনাতন একবার কলিকাটী তুলিয়া লইয়া তামাক টানিবার মৎলব করিতেছিল, তা মুকুয্যের ব্যাপার দেখিয়া, তাহার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। তা হউক, মুকুয্যে মশাইয়ের ভাব দেখিয়া, সনাতন, যে নিশ্চয়ই কোন সু-খবর আনিয়াছে, বুঝিতে পারিল। তখন সে মুকুয্যের কাছে একটু আগু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ঠাকুর! আমি এখনও ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; ব্যাপারখানা কি, বুঝাইয়া দিন।

মুকুয্যে মশাই বলিলেন, "আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তোর মাকে গিয়া বল্‌গে যা, আগামী দিনে গোবিন্দ ঘোষকে

খালাস করিয়া আনিব! যদি না পারি, তবে এই গোপাল মুকুয্যে বামুন নয়!" মুকুয্যে হাত দিয়া পৈতা ঘুরাইয়া লইলেন।

সনাতন কয়দিনেই মুকুয্যেকে বুঝিতে পারিয়াছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সুচতুর মুকুয্যে যে মিথ্যা কথা বলে নাই, তাহা সনাতনের দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল। তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে আগে সে সুখবর দিতে সনাতনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাড়াতাড়ি কেমন করিয়া গোবিন্দ ঘোষকে খালাস করা হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে সনাতন ভুলিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহার মুখে হাতে একটু জল দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও সনাতনের মনে পড়িল না।

"ঠাকুরমশাই, প্রণাম গো! তবে আসি" বলিয়া সনাতন সবে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর দিকে চলিল। মনের আবেগ, মুকুয্যের যে সনাতনকে বসিতে বলা উচিত ছিল, তাহা মনে হইল না।

গোপাল মুকুয্যে এতক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারিলেন যে, নফর যে শুধু লোভে পড়িয়া নীলরতনের হীরার আংটী গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর গহনার বাক্সে রাখিয়াছে, তাহা নহে। সে অতি লোভে পড়িয়া আংটী বাক্সে রাখিবার পূর্ব্বে তিনকড়ির যোগসাজিতে আর এক চাল চালিয়াছে। তিনকড়ি আবার চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে। নফরকে কিছু খবরা দেয় নাই। মুকুয্যের কেবলমাত্র সন্দেহ ছিল যে, হয়ত অনেক দিন হইতে নফরের সঙ্গে তিনকড়ির কার-কারবার চলিয়া আসিতেছে; তা যখন তিনি টের পাইলেন যে, আংটী চুরির আগে তিনকড়ির সঙ্গে নফরের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তখন এই আংটীর যে কোনরূপ রূপান্তর তিনকড়ি করিয়াছে, তাহা সুচতুর গোপালের বুদ্ধির অগোচর রহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

আদালতে।

হুগলীর কাছারি লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না। আজ গোবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমার দিন, সমগ্র রায়পুরের প্রজারা উপস্থিত হইয়াছে। তা ছাড়া হেমন্তকুমার, অমূল্যকুমার ও নীলরতনের গ্রাম হইতেও কম লোক আমদানি হয় নাই। বড়ই জেদের মোকদ্দমা;—উভয় পক্ষই বড় বড় উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোক মোকদ্দমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে শুনিয়া অনেক ছুট্‌কো উকীল অমনি তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সামলায় আদালত গিস্‌গিস্ করিতেছিল। আর্দালিদের ভিড় ঠেলিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। দর্শকেরা এ দরজা হইতে তাড়া খাইয়া ও দরজা দিয়া ঢুকিতেছিলেন। অনেককে গলাধাক্কা খাইতে খাইতে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তবুও ফাঁক পাইলে মাথা গলাইতে ছাড়িতেছিল না। সনাতন অনেক কষ্টে এক কোণে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল, চাপরাসি সাহেব দেখিতে পাইলে দুই চারি আনা পয়সা দিয়া নিস্তার পায়।

সনাতন হাঁ করিয়া উকীল-মোক্তারের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল। যেখানে মক্কেলরূপ মধুর কলসী, সেখানে উকীল-মাছিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ভেন্ ভেন্ করিয়া উড়িয়া বসিতে যাইতেছিল। তা কাছায় বাঁধা টাকা—মক্কেলগণ কিন্তু কেবল পুরাতন নামজাদা উকীলদেরই আমল দিতেছিল, আর কচিৎ যে দুই একজন নূতন উকীল আমল পাইতেছিল, তাহাদের লম্ফ ঝম্প দেখে কে? বরং তাহাদেরও পার আছে, যাহারা আদৌ আমল পাইতেছিল না, তাহারা আবার আরও ব্যস্ত। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ছেঁড়া পুরাণ নথীর এক প্রস্থ নকল বগলে করিয়া তাদের দৌড়াদৌড়ি কত! এই কাছারিতে, এখনই বাহিরের পানের দোকানে, তারপর তামাকে এক টান দিয়াই হাকিমের চাপরাসীর কাণে কাণে কথা, আবার আদালতে;—যেন মক্কেলের কাজে আর বেচারীদের হাঁফ ছাড়িবারও ফুরসুতটুকু নাই। আদালতের ভিতরেও সকলেই ব্যতিব্যস্ত। বাহিরে গাছতলায় টর্গি সাক্ষী শিখাইতেছিল; পাশে কেরোসিনের বাক্সের উপর কার্টবিজ কাগজে মুহুরি দরখাস্ত মুসাবিদা করিতেছিল, অদূরে ভেণ্ডার ৭।০ আনার ষ্ট্যাম্প ৮/০ কমে দিবে না বলিয়া বচসা করিতেছিল, সামনে দিয়া একজন পুরাণ উকীলের সঙ্গে সঙ্গে বিশজন মামলাকারী দৌড়িতেছিল। চারিদিকেই বিষম গোল; এমন দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, টানাটানি, কাণাকাণি, সনাতন আর কখনও দেখে নাই।

ক্রমে যথাসময়ে হাকিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগে আগে বাক্স-ঘাড়ে আর্দালি, পিছনে ছড়ি-হাতে চূড়া-ধড়া-আঁটা হাকিম;—যেন যশোদার নন্দদুলাল পাচনি-হাতে গোষ্ঠে

যাইতেছেন। উপস্থিত লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, হাকিম আসনে বসিলেন। উকীল মোক্তারেরা উঠিয়া ঘাড় নোয়াইল, হাকিমও প্রত্যভিবাদন করিলেন। আরদালিদের "চুপ চুপ" শব্দে আদালতের গোল কথঞ্চিৎ থামিল!

তারপর কাণে-কলম-গোঁজা পেস্কার মহাশয় নথীর তাড়া লইয়া মৎফরকা পেস্ করিতে আসিলেন। যাহাদের নিকট হইতে দু-পয়সা পাইয়াছিলেন, অল্প আয়াসেই তাহাদের কাজ হাসিল হইয়া গেল। আর যাহারা দু'পয়সা দিতে একটু "কিন্তু" করিয়াছিল, তাহাদের নথী সংক্রান্ত কাগজ-পত্র 'সিজিল' হয় নাই বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বেচারীরা আবার হুগলী আসিতে না হয় বলিয়া, চোকে চোকে পেস্কার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া কাজ নিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আজিকার এত গোলে পেস্কার মহাশয় আর বড় তাহাদের দিকে নেক-নজর দিলেন না। একটী নব্য উকীল তাহার মক্কেলকে পেস্কারকে কিছু দিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মক্কেলের নথী আগামী তারিখে পেস হইবার হুকুম হইয়া গেল। উকীলবাবু সিকায়ত করিতে অগ্রসর হইলে পেস্কার মহাশয় একটী লিখিত কৈফিয়ৎ দর্শাইয়া কহিলেন, "উহাঁর নথীর কাগজ যে রেজিষ্টারিতে আছে, সে রেজিষ্টারি উই-এ কাটিয়াছে, জীর্ণোদ্ধার করিতে তিন মাস সময় লাগিবে।" সেরেস্তার কথা নব্য উকীল কি জানিবেন,—অগত্যা তাঁহার বসিবার আসন ফিরিয়া লইতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার মক্কেলের কাজ একদিনের জায়গায় তিন মাস দেরি পড়িয়া গেল।

তারপর দরখাস্ত লওয়া হইল। ক্রমে মোকদ্দমা ডাক শুরু হইল। অনেক উকীল-মোক্তার দেখিয়া হাকিম আগেই দু-চারটে পাঁচ আইনের ও গরু-ছেনালি মোকদ্দমা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া গোবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমা পেস করিতে বলিলেন। একজন কন্‌ষ্টেবল গোবিন্দ ঘোষকে হাজত হইতে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।

গোবিন্দ ঘোষ মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। তথাপি তাঁহার নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। আজ কুচক্রীর কুচক্রে বিনা অপরাধে চোর অপবাদে গোবিন্দ ঘোষ হাকিমের সম্মুখে! হা ভগবন্! এর চেয়ে যে গোবিন্দের মৃত্যু ছিল ভাল। নিরীহ গোবিন্দকে দেখিয়া অশ্রুধারায় অনেকের হৃদয় গলিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রবঞ্চনাশূন্য সরল সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও তাঁহাকে চোর বলিয়া বিশ্বাস হইল না। হাকিমের নিজের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বলিয়া দিতেছিল যে; 'গোবিন্দ কখন চুরি করে নাই।' কিন্তু তিনি কি করিবেন? যখন বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনিই বা কিরূপে ছাড়িয়া দেন। তা হোক, আদালত শুদ্ধ লোকের সহানুভূতি কিন্তু গোবিন্দ -ঘোষের উপর পড়িয়াছিল।

আজ ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জেরা হইবার দিন। প্রথম সাক্ষী নীলরতনকে জেরার সময় আংটীটি দেখাইয়া ঠিক সেই আংটীটী তাঁহার চুরি গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন, "হাঁ, এই আংটীটাই চুরি গিয়াছে।" আংটীটীর হীরাখানি তাঁহার কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল, তাই তিনি

একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তা হউক, শেষে তিনি সেই আংটীটিই চোরাই মাল বলিলেন।

প্রথম সাক্ষীতেই নফরের মুখ শুকাইয়া আসিল।

পরের সাক্ষী পাঁচু শেখ—"অনেকগুলা স্মরণ নাই" শিখিয়া আসিয়াছিল। আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"পাঁচু! তুমি কতবার সাক্ষ্য দিয়াছ?"

উ। স্মরণ নাই।

আবার জিজ্ঞাসা হইল, "কতবার জরিমানা দিয়াছ?"

উ। স্মরণ নাই।

এইবার একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতবার জেলে গিয়াছ?"

অমনি বাদীর উকীল আগু হইয়া বলিলেন, "হুজুর! আমার সাক্ষী যা জানে, তাই বলিবে। যদি তাহার স্মরণ না থাকে, উকীল মহাশয় না হয় স্মরণ করাইয়া দিন; কিন্তু তাই বলিয়া আমার সাক্ষীকে ধম্‌কাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে।"

প্রশ্রয় পাইয়া পাঁচু বলিল, "আমি ত বলিতেছি, আমার স্মরণ নাই; তবে উনি যদি আমার সঙ্গে গিয়া থাকেন, না হয়, স্মরণ করাইয়া দিন।"

আদালত-শুদ্ধ হাসি পড়িয়া গেল। হাকিম পাঁচুকে একটু ধম্‌কাইলেন। তা হোক, আদালতে বিপক্ষের উকীলকে যে অপ্রতিভ করিতে পারিয়াছে, এই ভাবিয়া পাঁচু ফুলিয়া উঠিতেছিল। আর বাড়ী গিয়া তাহার জবর সাক্ষী দিবার কথা কেমন করিয়া বুক ফুলাইয়া গুছাইয়া বলিবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

তার পর কয়েকটা বরাবলে সাক্ষী পাঁচুর মত "স্মরণ নাই" বলিয়া নিস্তার পাইল। পরে সাক্ষী নফরের জেরা আরম্ভ হইল। নীলরতনের হাতে ঠিক সেই আংটিটা দেখার পরে সেইটা আসামীর স্ত্রীর গহনার বাক্সে পাওয়া যাওয়া সম্বন্ধে বলিতে সাক্ষীর বড় একটা গোল হয় নাই। বাক্সের অধিকারী যে-আসামী এবং তাহারই কাছে যে বাক্সের চাবিকাটী থাকে, সে কথাও সাক্ষী ঠিক বলিয়াছিল। তবে তিনকড়ির সঙ্গে তাহার পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসার সময় সাক্ষী বড়ই গোল করিতে লাগিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া প্রথমে বলিল যে, তিনকড়িকে চেনে না, পরে বলিল, হাঁ চেনে বটে, তবে ঠিক চেনে না। একবার বলিল, সে তিনকড়ির বাড়ী যায় নাই, আবার বলিল, হাঁ, কেবল একদিন মাত্র গিয়াছে। তাহার কথায় হাকিমের মনে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

তার পর যে সেক্‌রা নীলরতনের আংটী গড়িয়াছিল, তাহার জবানবন্দী হইল। তাহাকে আংটী দেখান হইলে, সে চোকে চশমা আঁটিয়া একবার ডান হাতে, একবার বাম হাতে করিয়া আন্দাজে আংটীটি ওজন করিয়া, একবার আলোর দিকে মুখ ফিরিয়া আংটীর হীরাটী দেখিয়া, একবার নিচুদিকে মুখ করিয়া আংটীটী দেখিয়া, ছাপ্পান্ন রকম মুখভঙ্গী এবং ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া শেষে বলিল, "হুজুর, আংটীটী আমার তৈয়ারি বটে, তবে কে যেন হীরাখানি বদলাইয়াছে।" তখন আবেগে পিছন হইতে নফর বলিয়া উঠিল, "না—কেহ বদলায় নাই, হীরা যেমন ছিল, তেমনই আছে।" নফরের দিকে সকলের নজর পড়িল, নফর কাঁপিতেছিল। হাকিম তাহাকে সম্মুখে রাখিতে বলিলেন।

তার পর সাক্ষী সোক্‌রা আঙ্গুল দিয়া হীরার বাঁধন একটু খুঁটিয়া নাড়িলে হীরাখানি পড়িয়া গেল। তখন সে বলিল, "হুজুর! হীরাখানি নিশ্চয়ই কেহ বদলাইয়াছে। আমি যে হীরাখনি বসাইয়াছিলাম, কাহার সাধ্য আঙ্গুল দিয়া খুঁটিয়া তাহাকে বাহির করে? আর এ যে দেখিতেছি, আসল হীরাখানি খুলিয়া লইয়া কে নকল হীরা বসাইয়া দিয়াছে! তবে তাড়াতাড়িতে বসাইবার সময় পায় নাই বলিয়া, যেমন তেমন করিয়া আঁটিয়া দিয়াছে।"

আদালত-শুদ্ধ লোক কাণাকাণি করিতেছিল, "এ কাজ নফ্‌রা ছাড়া আর কাহারও নহে!"

তখন গতিক দেখিয়া ফরিয়াদীর উকীল দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর! আপনাদের সন্দেহ অমূলক। আমার মক্কেল যখন বলিতেছেন যে, এই আংটী তাঁহার চুরি গিয়াছিল, তখন আপনাদের সন্দেহের কোন কারণ নাই; তবে যখন অনেক সাক্ষীই বলিতেছে যে, আংটির রূপান্তর হইয়াছে, তাহাতেই বা কি? আসামী যেরূপ চতুর দেখিতেছি, তাহাতে সে দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ম নিজেই আংটীর হীরা বদল করিয়া রাখিয়াছিল। আর আংটীর ফ্রেম যে বাদীর, তাহা ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আসামীর কোনমতে অব্যাহতি হইতে পারে না। অনেকে দেখিতেছি, আমার সাক্ষী নফরকে সন্দেহ করিতেছে; কিন্তু এ সন্দেহও অমূলক। সাক্ষী পাড়াগেঁয়ে লোক, কখন আদালতে আসে নাই; এখানে আসিলে সহজেই লোকের বুদ্ধিভ্রম হয়, তা জেরায় যে তাহার মত সরল সাক্ষীর বুদ্ধিলোপ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

তার পর উকিল বাবু আদালতকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাগ্মিতার স্রোত ছুটাইয়া দিলেন। সে স্রোত, সে হাত নাড়া, সে মুখ নাড়া দেখে কে? উকিল বাবু বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আসামী বড়ই চতুর! সে ভীষণ প্রবঞ্চক, দস্যু, চোর, ডাকাত, তাহাকে পুলি-পোলাও না পাঠাইলে সমাজের আর নিস্তার নাই; সুতরাং ধর্ম্মেরও রক্ষা নাই। যে এমন বহুমূল্য আংটি দিন-দুপুরে চুরি করিতে পারে, সে অনায়াসেই লোকের গলায় ছুরি দিতেও পারে! সুতরাং এমন খুনী আসামীর পুলপোলাওই প্রকৃতস্থান। আর আসামী দিন-দুপুরেই চুরি করিয়াছিল, নহিলে আংটী তাহার বাক্সে কেমন করিয়া গেল। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

হাকিম এই বক্তৃতা শুনিয়া মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন জানি না, কিন্তু সনাতনের গা গস্ গস্ করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, একবার উঠিয়া, উকীল বাবুর মুখ লইয়া কাছারির নূতন বালি-ধরান দেয়ালে ঘসিয়া দেয়।

বক্তৃতার স্রোত কমিলে হাকিম দেখিলেন যে, যদিই স্বীকার করা যায়, আংটির রূপান্তর হইয়াছে, তথাপি তাহা যে, নফর কর্ত্তৃক হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর অন্য কেহ যে আসামীর বাক্সে এ আংটীটি রাখিয়াছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? হাকিম কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। কেবল বসিয়া বসিয়া তাঁহার কলমের মাথা চিবাইতেছিলেন।

এমন সময় কাছারির সম্মুখ হইতে বড় একটা গোল উঠিল। হাকিম শুদ্ধ সকলেরই নজর সেই দিকে পড়িল! তাহারা দেখিল, তিনকড়িকে বাঁধিয়া দারোগা টানিয়া লইয়া আসি-

তেছে। পিছনে পিছনে মুকুয্যে মশাই গলদঘর্ম্ম হইয়া আসিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে দারোগা তিনকড়িকে লইয়া আদালতের সম্মুখে হাজির করিল। পরে পা দুখানি গোটো করিয়া দাঁড়াইয়া উল্টাহাতে হাকিমকে সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর! তিনকড়ি সেকরাকে আপনার অজানা নাই। অনেকবার সে জেল খাটিয়াছে, সম্প্রতি আবার নফরের সঙ্গে সে নীলরতনের আংটির বহুমূল্য হীরা চুরি করিয়াছিল। গোপাল মুকুয্যের বাড়ী খানাতল্লাসে এই হীরাখানি বাহির হইয়াছে!" বলিয়া হীরাখানি আদালতের সম্মুখে ধরিল।

সেই মুহূর্ত্তে হীরাখানি দেখিতে আদালত শুদ্ধ লোক মুখ বাড়াইল। গোবিন্দ ঘোষ খালাস পাইবে বলিয়া রায়পুরের লোকেরা একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। বাদীর উকীল পূর্ব্ব হইতে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন। সনাতন মনের আবেগে "হরিবোল" বলিয়া উঠিল; তাহাকে থামাইতে আর পঞ্চাশ জন চুপ-চুপ করিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে আদালতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের জয়।

গোলমাল একটু থামিলে পর, হাকিম নফরকে সম্মুখে ডাকাইয়া সব জিজ্ঞাসা করিলেন। নফর অধোবদনে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। কেমন করিয়া সে লোভে পড়িয়া লীলা ও তাহার ঠাকুরমাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া লীলা-চুরির সাহায্য করিয়াছিল, কেমন করিয়া তার পর নীলরতনের কথায় তাঁহার আংটিটী লইয়া গোবিন্দ ঘোষের বাক্সে রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তার পর কেমন করিয়া অতি লোভে পড়িয়া তিনকড়ির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আংটীর হীরাটী খুলিয়া লইয়া নকল হীরা বসাইয়াছিল, কেমন করিয়া সুযোগ পাইয়া গোবিন্দের বাক্সে আংটী রাখিয়াছিল, কোন কথাই গোপন রাখিল না। সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া তিনকড়ি হীরাখানি লইয়া নফরকে ফাঁকি দিয়াছিল, সে কথাটীও বলিয়া ফেলিল। তার পর হাকিম তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। অবিলম্বে

গোবিন্দ ঘোষ খালাস পাইলেন ; আর নফর ও তিনকড়িকে তাঁহার স্থানে দাঁড় করাইতে হুকুম হইল।

একটা কালান্তক যমদূতের মত পশ্চিমে কনৃষ্টেবল নফরকে হিচ্‌ড়িয়া টানিয়া কাটগড়ায় লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় নফর হঠাৎ তাহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া যেখানে গোবিন্দ ঘোষ দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। পরে ধূলায় শুইয় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া দুই হাতে গোবিন্দের পা-দুখানি ধরিয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "প্রভু, পিতা, আজ আদালত সাক্ষী ; লোভে পড়িয়া যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই! বুঝি নরকেও এ পাপীর স্থান হইবে না। যেদিন হইতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই যে কি তুষানলে পুড়িতেছি, কি বলিব! আর সহ্য হয় না, এখনই আমায় জেলে পুরুন ; কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র——"

নফর আর বলিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে দৃশ্যে, সে পাপীর সে অনুতাপে আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল ; পশ্চিমে কনৃষ্টেবলেরও নফরকে উঠাইতে হাত উঠিতেছিল না।

এদিকে সহৃদয় গোবিন্দ ঘোষের বুক দুটী চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন সেই স্নোক্রন্দমান গোবিন্দ ঘোষ দুই হাতে নফরকে ধরিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আয় নফর! আয়, তোকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলাম। না বুঝিয়া যে কাজ করিয়াছিস্, তাহার জন্ত আর দুঃখ করিতে হইবে না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না আমার অদৃষ্টের ভোগ ছিল, কাটিয়া গিয়াছে! আয়, চল্

দুজনে গৃহে যাই। আবার যেমন ছিলাম, তেমনি করিয়া সময় কাটিবে।" গোবিন্দ ঘোষ নফরকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

"আহা, এমন লোকেরও এমন হয় গা!" বলিয়া আদালত শুদ্ধ লোক চোক মুছিতেছিল। হাকিমও রুমালে চক্ষু মুছিতে ছিলেন। বাদীর উকীলেরও মনটা কেমন-কেমন হইয়া আসিতেছিল।

সনাতন এতক্ষণ কোণে বসিয়া বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, আর তাহার সহ্য হইল না। দু'পাশের লোক-গুলিকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া, গোবিন্দ ঘোষের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আর কাজ নাই ঘোষজা মশাই! ও হতভাগ্যাকে ছাড়িয়া দিন, ওর মুখ দেখিলেও পাপ আছে; চলুন, ঘরে চলুন। মা অনশনে আছেন, আপনি না গেলে মুখে জল দিবেন না।" সনাতন গোবিন্দ ঘোষকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ নফরকে ছাড়িলেন না। সনাতনও গোবিন্দকে ছাড়াইয়া লইতে ব্যস্ত।

সেই সময়ে আদালতে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সংসারপ্রবণতার সঙ্গে ঐশীশক্তির সংগ্রাম। বুঝি বা ঐশীশক্তির পরাজয় হয়। বুঝি, সনাতন গোবিন্দ ঘোষকে বলে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সনাতনকে আর বেশী টানিতে হইল না। সেই পশ্চিমে কন্‌ষ্টেবল কোনমতে চক্ষু মুছিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে তু কোন্ হায়! হামারা মুদানা ছোড় দেও।" সনাতন থতমত খাইয়া গেল, গোবিন্দ ঘোষ নফরের হাত ছাড়িয়া দিলেন,

হাকিম গোলযোগ দেখিয়া সেদিনের মত মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিলেন। তিনকড়ি ও নফরের হাজতের হুকুম হইল। গোবিন্দ ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নফরের মূর্ত্তি কাছারির ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তার পর ক্রমে আবার আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইলে, অমূল্যকুমারের মোকদ্দমা ডাক হইল, তাহাতে আর কারণ দর্শাইতে হইল না; অমনিই মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। তখনই নীলরতনের খোঁজ পড়িল, গোলযোগের সূত্রপাতেই নীলরতন অদৃশ্য হইয়াছিলেন। অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক-ঘরে।

লীলা বাপের বাড়ী আসিয়াছেন। হেমন্তকুমার একবার লীলার শ্বশুরকে লীলা কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, লীলার শ্বশুর একেবারে লীলাকে সঙ্গে লইয়া অতবড় একটা দায় ঘাড়ে করিতে সাহস করেন নাই। মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মোকদ্দমার কথা ঘরে ঘরে। কি জানি, ঐ সব কথা লইয়া সমাজে যদি একটা গোলযোগ ঘটিয়া বসে, তাই ভাবিয়া লীলার শ্বশুর এখন লীলাকে আনা, অতটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তাই অত কথা না বলিয়া লীলার শ্বশুর হেমন্ত-কুমারকে বলিলেন, "অমূল্যকুমার ছেলে-মানুষ, বিশেষ এখন তাহার পাঠ্যাবস্থা; আর তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত, এখন দিনকতকের জন্য লীলা যেমন আপনার কাছে আছে, তেমনি থাক্; তার পর আপনার মেয়ে, আমার ঘরের বৌ, দুদিন পরে আনিলেই হইল।" হেমন্তকুমার ফিরিয়া আসিলেন।

কাজেই লীলা বাপের বাড়ী রহিলেন, হেমন্তকুমার কিন্তু লীলাকে লইয়া বড় ভীত হইলেন। হেমন্তকুমারের অনেক জ্ঞাতি শত্রু, বিশেষ লীলার বিবাহের পর তাঁহার শত্রুর সংখ্যা বাড়ে বই কমে নাই। হেমন্তকুমারের সঙ্গে তুলনায় অমূল্যকুমারেরা অনেক বড় ঘর। অতবড় ঘরে অমন সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইলে কাহার না চোক টাটায়? বিশেষ আবার অমূল্যকুমার রূপে গুণে সর্ব্বাংশে লীলার উপযুক্ত পাত্র। লোকের এত ভাল কি দেখা যায়! লীলা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, 'সে যে অনেক দিন অপরিচিত লোকের বাড়ী ছিল' এই কথা লইয়া হেমন্তকুমারের আত্মীয়-কুটুম্বদের ঘরে ঘরে একটু আন্দোলন চলিতে লাগিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ঠাকুর-মা লীলাকে আদর করিতে কম করেন নাই। বরং অনেক দিনের পর আদরের লীলাকে পাইয়া ঠাকুর-মা আদরের একটু মাত্রা বাড়াইয়া ছিলেন। ঠাকুর-মার আদরের প্রথম নম্বরে ছিল—কান্নাকাটি, তার পর লীলাকে সাজানো, তাহার চুল বাঁধিয়া দেওয়া, তাহাকে গহনা পরাণো, তার পর অমূল্যকুমারের নাম করিয়া একটু পরিহাস করা। লীলাও নাকে কাঁদিয়া, তাহার "পান্‌সে চোকের" জল ফেলিয়া, ঠাকুর-মার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া, তাঁহাকে আঁচড়াইয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সে হাসি-তামাসা ছিল দুদিন। সে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ছিল—বড়ই অল্প সময়ের জন্য। লীলার ভাগ্যের সুখ, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত

দেখা দিয়াই লুকাইল। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে লীলার অদৃষ্টাকাশে মেঘ-সঞ্চয় হইতেছিল। ধীরে ধীরে লীলার জীবনের প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি সেই মেঘের অন্তরালে লুকাইতেছিল। ধীরে ধীরে লীলার জীবনের প্রভাতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতেছিল, বুঝি প্রভাতের ধীর সমীর আর সে মেঘরাশিকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, বুঝি সে ক্ষীণ উষার হাসি আর অমঙ্গল অন্ধকারকে দূর করিতে পারে না!

লীলা হেমন্তকুমারের বাড়ী আসিবার পরেই তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণের আত্মীয়তাটা কিছু বাড়িয়া গেল। লীলার পিসী-মা মাসী-মা, খুড়ী-মা, জ্যেঠাই-মা প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, তাঁহাদের আনাগোনার আর বিরাম নাই। লীলার পিসী-মার মেয়ে লীলার এক বয়সী। পিসী-মার বড় সাধ ছিল, তাঁহার মেয়ের ভাল ঘরে বিবাহ হয়। তা এমনি কপাল, লীলা বিবাহের পর ৩০০০৲ টাকার গহনা পাইল, আর পিসী-মার জামাই বিবাহের পরেই পিসী-মার ঘাড়ে পড়িয়াছে, কাজেই লীলার অদৃষ্ট দেখিয়া পিসী-মার মনটা একটু ভার-ভার হইয়াছিল। লীলার বিবাহের পর হইতে লীলার সুখ দেখিয়া, আর মেয়ের কপাল ভাবিয়া পিসী-মা আর হেমন্তকুমারের বাড়ী মাথা-গলান নাই। কিন্তু তা হইলে কি হয়? এত দিনের পর লীলা ঘরে আসিয়াছে, পিসী-মা কি তাহাকে একবার দেখিতে যাইবেন না? আর না যাইলেই বা লোকে কি বলিবে! কাজেই চক্ষু লজ্জার খাতিরে অন্ততঃ পিসীমাকে হেমন্তকুমারের বাড়ী আসিতে হইল। এতদিনের পর হঠাৎ পিসী-মার

ভাইঝীর উপর প্রবল স্নেহ উথলিয়া উঠিল; সেই স্নেহের স্রোতে ভাসিয়া পিসী-মা হেমন্তকুমারের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

পিসী-মা প্রথমে লীলাকে কত আদর করিলেন, তার পর তাহার কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, কত 'হায় হায়' করিলেন; আর সেই কষ্টে নিজে কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়া, কতবার নিজের মুখে আগুন দিলেন। নীলরতনকে কত গালি পাড়িলেন, আর তার চেয়েও গালি পাড়িলেন, সেই যণ্ডা মুসলমান লাঠিয়ালদের, যাহারা লীলাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। "পোড়ারমুখোদের কি একটু দয়া-মায়া নাই গা! তাহারা কেমন করিয়া লীলার ও-শরীরে হাত দিয়াছিল? তাহারা নাকি তিন দিন লীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল?" এইখানে পিসী-মা আর তাঁহার চক্ষের জল সাম্‌লাইতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "লীলাকে নাকি তিন দিন তাহাদের ভাত খাইতে হইয়াছিল?"

পিসী-মার অত ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যে লীলা তাঁহার সব কথা বুঝিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু দায়ে পড়িয়া ছু-একটা "হুঁ" "হাঁ" দিয়াছিল। আমাদের পিসী-মা তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লীলা তাঁহার কথা স্বীকার করিতেছে। পিসী-মা ভাবিলেন, মেয়েটা কি বোকা? তা হোক, পিস-মার কাজ হইয়া গেল, তিনি উঠিয়া গেলেন।

তারপর জ্যেঠাই-মা আসিলেন, তিনি আর একটা নূতন তথ্য জানিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোথা হইতে শুনিয়া-

ছিলেন, হৈমবতী লীলাকে আসিবার সময় একস্থুট সোণার গহনা দিয়াছেন। লীলার হাতে, তাহার বিবাহের সময়-পাওয়া সোণার বালা দেখিয়া, জ্যেঠাই-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৈমবতীর হাতে অমনি বালা আছে না?" লীলা উত্তর দিলেন, "হাঁ।" জ্যেঠাই-মার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, ঐ বালাই হৈমবতী দিয়াছেন। হৈমবতীই বা কোথা হইতে বালা দিবে? তাহার ত আর নিজের ধন নয়। ও বালা নীলরতনেরই দেওয়া হইল। তখন জ্যেঠাই-মার চোক ফুটিল, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, লীলা নীলরতনের দেওয়া-বালা পরিয়া আছে। জ্যেঠাই-মার মনে হইল, ছুঁড়ীটা কি বেহায়া গা! পরপুরুষের দেওয়া-বালা এখনও হাতে পরিয়া আছে!

এইরূপে পিসী-মার দল সকলে আসিয়া এক একটা সত্য আবিষ্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আর তাঁহাদের আবিষ্কৃত অপরূপ সত্যের মহিমা-ধ্বজা অতি শীঘ্র ঘরে ঘরে উড্ডীন হইতে লাগিল। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে হেমাঙ্গিনী, সরোজিনী, বিনোদিনী, মৃণালিনী, কামিনী, ভামিনী, নলিনী, বিমলা, কমলা, সরলা, সুশীলা, কুলবালা, রাজবালা, কিরণবালা, চন্দ্রমুখী, শশিমুখী, পদ্মমুখী, সরোজ, বিরাজ, হরের-মা, নটোর-মা, ভুতোর-মা, পদোর-মা, দলে দলে ব্যগ্র হইয়া সেই সত্যের খনি লীলাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। লীলা একে সুন্দরী, তারপর অত ভাল ঘরে, অমন সুন্দর পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, এত সুখও কি চোখে দেখা যায় গা? তা-পিসী-মার দলই বল, আর প্রতিবাসীর দলই

বল, আর সমবয়স্কার দলই বল, আর দাসীর দলই বল, যাহারা লীলাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ সকলে একমত হইয়া গেল। লীলার সাম্‌নে চোকোচোকি করিয়া, লীলাদের বাড়ীতে কাণাকাণি করিয়া, তাহাদের বাড়ীর বাহিরে একটু চেঁচাইয়া কথা কহিয়া, নিজের বাড়ীতে গেল। তারপর এই লইয়া, একটা হৈ-চৈ হইল। বৈকালে জল আনিতে গিয়া—নদীর ঘাটে জটলা করিয়া কমিটিতে তাহারা ঠিক করিল,—লীলা মুসলমানের ভাত খাইয়াছে; আরো ঠিক করিল, বলিতে লজ্জা করে, লীলা কুচরিত্রা। ভেড়ার দল কর্ত্তারা গিন্নীদের কথায় একটু দ্বিরুক্তিও করিলেন না। দেখিতে দেখিতে হেমন্তকুমার যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তিনি ‘এক-ঘরে’ হইলেন।

তখন হেমন্তকুমার একদিন অমূল্যকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অমূল্যকুমারের পিতা অমূল্যকুমারকে যাইতে দিলেন না। হেমন্তকুমার দেখিলেন, জন্মের শোধ লীলার সুখতারা ডুবিল। লীলা গোপনে অমূল্যকুমারকে আসিতে লিখিলেন। পত্রের উত্তর আসিল, “স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করি না।” লীলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে লীলার পিতা-মাতার, লীলার ঠাকুরমার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িতে লাগিল, আর যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অমনি সেই ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই ছায়ার প্রতিচ্ছায়া লীলার রূপের প্রভা মলিন করিতে লাগিল। লীলা যে চঞ্চলতা, হৈমবতীর ঘরে গিয়াও

হারায় নাই, আজ বাপ-মার ঘরে বসিয়া অজ্ঞাতসারে লীলার সেই চঞ্চলতা অপসৃত হইতে লাগিল। ঠাকুর-মা আর লীলাকে পরিহাস করেন না, তবে লীলাকে দেখিলে তাঁহার চক্ষে অলক্ষ্যে জল আসিয়া পড়ে। ঠাকুর-মাকে দেখিলেও লীলার চক্ষে জল আসে, তবে সে জল—কথার প্রতিবাদের জন্য "পান্‌সে চোকের" জল নয়। এখন লীলার চক্ষে জল পড়ে, তাহার হৃদয় ফাটিয়া—তাহার নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া। লীলার অদৃষ্টে, যে কেহ সংসারে তাহার সংসর্গে আসিয়াছে, তাহারই সুখের সঙ্গে সম্পর্ক ফুরাইয়াছে। লীলা ভাবিতেন, তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পঙ্কিল-স্রোত একবারে বহিয়া যায় না কেন? আর না যায় ত চারিদিকে স্বচ্ছসলিল অমন করিয়া কর্দ্দম-ময় করে কেন? কি বুঝিবে লীলা, কেমন করিয়া ইহার উত্তর দিবে? জগতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

হুঁকা-হাতে মুকুয্যের তামাক খাওয়ার বিরাম নাই। দিনের মধ্যে কতবার তাঁহার হুঁকায় কলিকা উঠে—পড়ে, তাহার একটা হিসাব রাখা বড়ই কঠিন। আর জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি কত ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছেন, তাহার হিসাব করিতে বুঝি বড় বড় গণিতজ্ঞেরও মাথা বিগড়াইয়া যায়, বুঝি পরার্দ্ধেও কুলায় না। মুকুয্যে, জীবনের জাগ্রত অবস্থার বার আনা ভাগ তামাক খাইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় তামাকের ধোঁয়া লাগিয়া বুদ্ধিটা খুব পাকিয়া উঠিয়াছিল; তবে একটু ধোঁয়াটে রঙ হইয়াছিল মাত্র। মুকুয্যের জীবন-অঙ্কে হুঁকা তাঁহার পৌনঃপুনিক দশমিক, ইহলোক হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে যাইয়া "স্বর্গরাজ্যে হুঁকার অস্তিত্ব" প্রতিজ্ঞা, বিধাতা জ্যামিতি-সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে মুকুয্যে স্বর্গে যাইতে সম্মত হইবেন কি না, নির্ণয় করা দুরূহ।

আজও হুঁকা-হাতে মুকুয্যে তাঁহার বাহিরের ঘরের দাও-য়ায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছেন। আজ তামাকটা বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তেমন করিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে হইতেছিল না, বা পাইচারির বেগ দিতে হইতেছিল না। এমন সময় হেমন্তকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথারীতি প্রণাম করিয়া বসিবার পর, মুকুয্যে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হেমন্ত-কুমার লীলাকে ঘরে লইবার পর যে কারণে 'এক-ঘরে' হইয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করি-লেন। শুনিতে শুনিতে মুকুয্যের তামাক-টানার বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তামাকের ধোঁয়ায় জড়াইয়া তাঁহার বুদ্ধিটা ওলট-পালট করিতে লাগিল। পরে, হেমন্তকুমারের কথা শেষ হইলে, মুকুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন?"

হেমন্তকুমার বলিলেন, "এখন উপায় আপনি। আজ আমি আপনার শরণাগত, আপনিই লীলার বিবাহ দিয়াছেন, আজ আপনিই তাহাকে রক্ষা করুন।" কথা বলিতে বলিতে হেমন্তকুমারের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

মুকুয্যে বলিলেন, "আপনি যান, দিনকতক পরে আসি-বেন। দেখি, কতদূর করিতে পারি।"

হেমন্তকুমার বিদায় হইলে পর, মুকুয্যে আর কয় ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছিলেন, তাহার একটা সঠিক হিসাব আমরা রাখিতে পারি নাই। তবে অনেক রাত্রেও ঘরে আসিলেন না দেখিয়া, মুকুয্যের গৃহিণী লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনেন। ঘরে আসিয়া খাইবার সময় নাকি মুকুয্যে ডালের

বাটীর জায়গায় দুধের বাটী পাতে ঢালিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া মুকুয্যের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন, "ও কি, পাগল হ'লে নাকি?" মুকুয্যে উত্তর দিলেন, "হুঁ।" তাহার পর আর কোন কথা কহেন নাই। মুকুয্যের গৃহিণী তাঁহার প্রকৃতি বেশ জানিতেন; তাই বুঝিলেন, আবার একটা কি পরের ভাবনায় মুকুয্যের মাথা-ব্যথা পড়িয়াছে। তিনি আর মুকুয্যেকে বিরক্ত করিলেন না।

ইহার পর কয়দিন নীরদাকে মুকুয্যের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে দেখা গিয়াছিল। আর আমরা দেখিয়াছি, মুকুয্যে গোপনে একদিন নীলরতন রায়েরও বাড়ী গিয়াছিলেন।

তার পর একদিন হঠাৎ মুকুয্যে অমূল্যকুমারের পিতার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর পাঠ্যাবস্থার বন্ধুকে পাইয়া অমূল্যকুমারের পিতা মুকুয্যের অনেক খাতির, যত্ন, আদর, অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে মুখে-হাতে জল দিয়া—জল খাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে মুকুয্যে উপবিষ্ট হইলে, অমূল্যকুমারের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে? ব্যাপারখানা কি?"

মুকুয্যে একেবারেই উত্তর দিলেন, "ব্যাপারখানা গুরুতর; হেমন্তকুমারকে সকলে 'এক-ঘরে' করিয়াছে।"

অমূল্যকুমারের পিতা বলিলেন, "তা ত জানি, কিন্তু কি করিব? উপায় ত কিছু দেখি না। কয়েক দিন হইতে তোমাকে ডাকাইব মনে করিতেছিলাম, তা ভালই হইয়াছে, আজ সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; এখন উপায় কি?"

মুকুয্যে বলিলেন, "তার জন্য আর বড় ভাবিতে হইবে না, আমি সব ঠিক করিয়া আসিয়াছি। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, রায়পুর হইতে রাজগ্রাম যাইতে যে কয়-ঘণ্টা লাগে, সেই কয় ঘণ্টামাত্র লীলা লাঠিয়ালদের কাছে ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহই মুসলমান ছিল না। লীলা তাহাদের ভাত খায় নাই। হৈমবতী লীলাকে কোন গহনাই দেয় নাই।"

অমূল্যকুমারের পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি যেমন অনুসন্ধান করিয়াছ, আমিও তেমনি অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করি নাই। তুমি যাহা জানিতে পারিয়াছ, আমি তোমার আগেই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তবে তোমার আমার জানায় কি আসে যায়! সকলে বুঝিবে কেন?"

মুকুয্যে বলিলেন, "তাহারও উপায় করিয়াছি। হৈমবতী স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি আর ফৌজদারি হাঙ্গামা না হয়, তবে যে যে লাঠিয়াল লীলাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলের সমক্ষে আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। তার পর নীলরতনের বাড়ী লীলা যে অবস্থায় ছিল, হৈমবতী নিজে বলিবেন; আর তিনি যে লীলাকে কোন গহনা দেন নাই, সে কথাও তিনি বুঝাইয়া দিবেন। এখন কেবল যাহারা হেমন্তকুমারকে 'এক-ঘরে' করিয়াছে, তাহাদের একদিন একত্র করিতে পারিলেই হয়।"

অমূল্যকুমারের পিতা বলিলেন, "এখনও বুঝি সব ঠিক হইল না। ইহাতেও যদি হেমন্তকুমারের জ্ঞাতি-শত্রুরা বিশ্বাস না করে?"

মুকুয্যে বলিলেন, "বিশ্বাস না করার কারণ দেখি না। হৈমবতী বড় ঘরের মেয়ে, বড় লোকের স্ত্রী; তাঁহার সত্য কথায় অবিশ্বাস করে কাহার সাধ্য? তবে যদি কেহ নিতান্ত অবিশ্বাস করে, তবে তাহার জন্য হৈমবতী আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে রাজি আছেন।"

"আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ?" অমূল্যকুমারের পিতা বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অধিক আরও কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে?"

মুকুয্যে হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ভায়া! সংসারে এতকাল কাটাইলে, এখনও 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' বুঝিলে না? এ 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' হৈমবতীর সিন্দুকের চাবির ভিতর থাকে! যাহার হাতে পড়ে, সে জগৎটা করতলন্যস্তামলকবৎ দেখিতে পায়। লীলা-চুরির ব্যাপারটা আর দেখিতে পাইবে বিচিত্র কি? হৈমবতী তাহার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রচুর 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' ব্যয় করিতে রাজি আছেন!"

অমূল্যকুমারের পিতা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বটে বটে! তা তিনিই বা একা অত 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' দিতে যাইবেন কেন! অমূল্যকুমার আমার এক ছেলে, আর লীলার মত রূপগুণবতী কন্যা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তা অমূল্যকুমারই যদি অমন বৌকে লইয়া ঘর করিতে না পারিল, তবে আমারই বা সংসারে থাকিয়া লাভ কি? আর তুমিও জান, ভগবানের কৃপায় আমিও কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, (তিনি বৈঠকখানার কাঠের ফ্রেমে বসান ফায়ার প্রুফ লোহার সিন্দুক দেখাইলেন) তা না হয় বেটার জন্য, বৌএর জন্য, কিছু খরচই করিলাম।"

মুকুয্যে বলিলেন, "তবুও ভাল, এ কথা আগে তোমাকে বলিতে সাহস হয় নাই। কি জানি, তোমরা ছেলের বাপ, ছেলের আর একটা বিবাহ দিতে কতক্ষণ? তা যাহা হউক, যখন তুমিও খরচ করিতে রাজী আছ, তখন 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' ত প্রত্যক্ষতর হইয়া গেল। আর 'এক-ঘরের' কথাটা ছাড়িয়া দিলেই হয়। অ'রে তামাক দে।" অনেকক্ষণ মুকুয্যের তামাক খাওয়া হয় নাই।

মুকুয্যে তামাক খাইয়া উঠিতেছিলেন, অমূল্যকুমারের পিতা হাত ধরিয়া বসাইলেন। "আরে, এমন সন্ধ্যের সময় যাবে কোথা? অনেক দিনের পর দেখা, না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" অগত্যা অমূল্যকুমারের পিতার নির্ব্বন্ধে মুকুয্যে সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেখি।
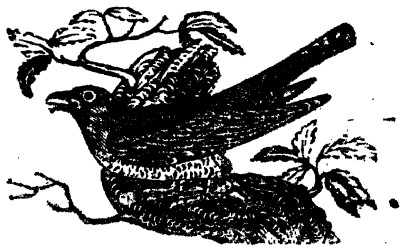
ধন্য মুকুয্যের বুদ্ধি! আর ধন্য সমাজের দিব্যজ্ঞান! দিন-কতক মুকুয্যের হাঁটাহাঁটিতে, কোথাও রজত-মুদ্রার বিতরণে, কোথাও রজতমুদ্রার প্রলোভনে, ক্রমে ক্রমে সমাজের বোল ফিরিল। এই দুদিন আগে যাহারা হেমন্তকুমারকে 'এক-ঘরে' করিবার নেতা ছিলেন, আজ তাঁহারাও ও-কথা উঠিলে বড় একটা কিছু বলেন না। দু-একজন এরি মধ্যে হেমন্তকুমারের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। বলেন, "অমন ঢের হইয়া থাকে।" যদিও হেমন্তকুমারকে সমাজে লইবার জন্য একটা বিরাট আয়োজনের কথা হইয়াছিল, তথাপি এরি মধ্যে হেমন্ত-কুমারের 'এক-ঘরের' কথাটা ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল। এ কথা হেমন্তকুমার বুঝিতে পারিলেন। অমূল্যকুমারের পিতারও বুঝিতে বাকি রহিল না। সকলেই আশ্বস্ত হইলেন! ঠাকুর-মা পর্য্যন্ত চোকের জল মুছিলেন। কিন্তু তবুও এ সব দেখিয়াও দেখিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না, কেবল লীলা।

লীলা ধীরে ধীরে আপনার উপর বিশ্বাস হারাইতেছিল। 'এক-ঘরে' হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীলার অলোক-সামান্ত সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক সরলতা সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। শিশু লীলাকে কোলে করিতে লোকের কতই না যত্ন ছিল! তখন লীলা কেমন লহর তুলিয়া হাসিতে পারিত; আর সেই হাসি দেখিতে আর সঙ্গে সঙ্গে লীলাকে নাচাইতে লোকের কতই না আগ্রহ ছিল! বালিকা লীলার সহচরীগণের লীলাকে না পাইলে খেলা হইত না। তখন লীলা যাহাদের বাড়ী খেলিতে যাইত, তাহাদের বাড়ীর গৃহিণীরা কত যত্ন করিয়া লীলার আগুল্‌ফলম্বিত কেশ বিনাইয়া দিত। ভবিষ্যতে স্বামীর ঘর আলো করিবে বলিয়া, কত আশীর্ব্বাদ করিত। লীলার জন্ম কে কত তপস্যা করিয়াছে; সেই তপস্যার বলে লীলাকে পাইবে বলিয়া কতই আশ্বস্ত করিত। এইরূপ ঘটনাবলীর সংযোগে লীলা সংসারকে সুখের কাম্যকানন দেখিত, ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস ছিল, বুঝি এমনি দিনই কাটিবে। নিজের উপরে ততোধিক বিশ্বাস ছিল। লীলা যা মনে করে, তাই হয়; যা চায়, তাই পায়।

'এক-ঘরে' হইবার পরেই পৃথিবীর কাঁটা প্রথম লীলার পায়ে ফুটিল। লীলা দেখিল, জগৎসংসার আর লীলার মনের মত হইয়া চলে না। যেমনটি ছিল, তেমনটি আর রহিল না। লীলা ঠাকুর-মার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে চোখের জল; বাপ-মার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে বিষাদের কালিমা; সহচরীদের দিকে চাহিল, তাহারা মুখ ফিরাইল; আত্মীয় কুটুম্বদের দিকে চাহিল, তাহারা ফিরিয়াও দেখিল

না, তাই লীলার নিজের উপর বিশ্বাস টলিল; লীলা আত্ম-হারা হইল। তখন সেই গাঢ় অন্ধকারে শান্ত জ্যোতির রেখা, অসীম মরুভূমে শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্র স্বামীর মুখ লীলার হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিল। লীলা দেখিল, নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে বটে, কিন্তু স্বামীর উপর বিশ্বাস হারায় নাই। জগতে স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি—স্বামী; সেই স্বামীর উপর লীলার অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

অনেক গোপনে, অনেক দুঃখে, বড় ভয়ে ভয়ে লীলা অমূল্যকুমারকে পত্র লিখিয়াছিল। এ পত্রের কথা আর কেহ জানিত না, লীলা আর কাহাকেও বলা প্রয়োজন মনে করে নাই। তার পর সে পত্রের যে উত্তর আসিয়াছিল, তাহাতে অকৃতাপরাধা লীলা মরমে মরিয়াছিল। এতদিন লীলার স্ফুটনোন্মুখ হৃদয় আশাবদ্ধ হইয়াছিল, উত্তর পাইবার পর শুকাইতে আরম্ভ করিল, তাই এতটা কাণ্ড হইয়া গেলেও লীলা ফিরিয়া দেখিল না; তাই সকলে চোকের জল মুছিলেও লীলার চোখের জল শুকাইল না।

লীলা তাহার প্রিয়দ্রব্যে বীতস্পৃহ হইতেছিল। পোষা পাখীটিকে তেমন করিয়া আর আদর করে না। খেলে-নার বাক্স তেমন করিয়া সাজায় না, গহনার বাক্স তেমন করিয়া নাড়ে চাড়ে না। লীলার বড় আল্‌তা পরার সাধ ছিল, পাড়ার কোথাও নাপিতানী আসিলে লীলা গিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইত; আর পায়ে ও হাতে আল্‌তা না পরিয়া সাজিয়া তাহার মনঃপূত হইত না। নাপিতানীরও সেই সুন্দর রাঙ্গাপায়ে আল্‌তা না দিলে আল্‌তা পরান সার্থক হইত না;

আজ ঘরে আসিয়া নাপিতানী ডাকা-ডাকি করিল, লীলা আল্‌তা পরিতে উঠিল না। মেছুনী মাগী বড় উজ্জ্বল টিপ্‌-পোকা আনিয়াছে, লীলা ফিরিয়াও দেখিল না। জল না পাইয়া লীলার সাধের গোলাপ গাছ শুকাইল। আহার না পাইয়া লীলার প্রিয় লাল মাছগুলি মরিল। যত্নের অভাবে লীলার সুন্দর খেলেনায় ছাতা পড়িল।

এ পরিবর্ত্তন সকলেই বুঝিতে পারিল। ঠাকুর-মা মনে করিলেন, 'কেন এমন হয়!' হেমন্তকুমার মনে করিলেন, বুঝি ছেলেমানুষ লীলার মন হইতে এখনও 'এক-ঘরে' হওয়ার কথাটা যায় নাই।' পাড়ার লোকেরা তখন মনে করিল, 'বুঝি লীলাকে অপদেবতাতে পাইয়াছে।' তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ঠিক করিল, একবার অমূল্যকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা উচিত। অমূল্যকুমারের পিতাও এখন গোপনে অমূল্যকুমারকে পাঠাইতে বড় একটা অমত করিলেন না। লীলা কিন্তু এ কথা শুনিয়া, অমূল্যকুমারকে আনিতে নিষেধ করিলেন। লীলার কি হইয়াছে, কেহ বুঝিল না। এতদিনেও লীলার চক্ষের জল, মনের আগুন নিবিল না।

এই সময় একদিন নীরদা লীলাকে দেখিতে আসিয়াছিল। অমূল্যকুমার যে পূর্ব্ব হইতে লীলাকে সন্দেহ করিয়াছিল, এ কথা নীরদা জানিত; আর সেই সন্দেহে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে, নীরদা সে ভয় করিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া যখন শুনিল যে, সমাজের আগুন নেবো-নেবো হইলেও লীলা অমূল্যকুমারকে আনিতে মানা করিয়াছে, তখনই নীরদা বুঝিল, যে অমূল্যকুমার কি একটা কাণ্ড ঘটাইয়াছে। হেম-

বতীর গৃহে আসিবার সময় নীরদার কি যেন একটু লীলার উপর মায়া হইয়াছিল। লীলাও নীরদাকে কোন কথা বড় একটা গোপন করিত না।

আজ রুদ্ধদ্বারে—উপাধানে মুখ লুকাইয়া লীলা যেথানে অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইতেছিল, নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে নীরদা সেথানে উপস্থিত হইল। তার পর মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া নীরদা ডাকিল, "বোকা মেয়ে!"

লীলা মুখ তুলিল, কিন্তু কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

সযত্নে মুখ মুছাইয়া দিয়া নীরদা বলিল, "কাঁদিতে আছে কি? আর কি, দুদিন পরে স্বামি-সোহাগিনী হইবে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লীলা বলিল, "আমি না কাঁদিলে কাঁদিবে কে? তিনি যে দাসীকে পায়ে ঠেলিয়াছেন!"

নীরদা বলিল, "এই যে নেকা-মেয়ের মুখ ফুটিয়াছে, এ মুখ দুদিন আগে ফুটিলে আজ আর কাঁদিতে হইত না। নিজের মাথা নিজে খাইয়াছ! হৈমবতীর ঘরে এমন করিয়া কেন সব অমূল্যকুমারকে বুঝাইয়া বলিতে পার নাই?"

লীলা আবার উপাধানে মুখ লুকাইল।

নীরদা নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, "এবার যদি দেখা হয়, বুঝাইয়া বলিতে পারিবে ত?"

নীরদা বড়ই কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, অমূল্যকুমারকে দেখিলে লীলার সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। অনেক ভাবিয়া লীলা উত্তর দিল, "দেখি।"

তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরদা বাহির হইয়া গেল।
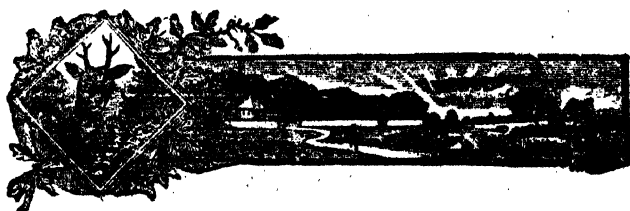
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকে।

পূর্ণিমা রজনী; জ্যোৎস্নায় জগৎ পরিপ্লাবিত। সে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ যেন পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আজ ভাগীরথীর স্রোতে, জ্যোৎস্না অন্তর্হিত;—সরোবরের ক্ষুদ্র বীচিক্ষোভের সঙ্গে পরিক্ষিপ্ত;—নৈশ-সমীরণের স্তরে স্তরে অন্তর্নিবিষ্ট; ফুলের হাসি জ্যোৎস্নামাখা, পাপিয়ার রব জ্যোৎস্না বিধৌত, কোকিলের পঞ্চম জ্যোৎস্না-তরঙ্গায়িত। সে জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া জড়-প্রকৃতি আজ সজীব, অনেক দিন প্রকৃতি এমন হাসি হাসে নাই। আজ প্রকৃতির এ হাসি এক নিশ্বাসে দেখিয়া শেষ করা যায় না; দেখিতে দেখিতে দিগন্তে মিশাইয়া যায়। এক দেখায় হৃদয় স্পর্শ করে না; যেখানে দেখি, সেই খানেই হৃদয়ের কথা; কোন্ কথা হৃদয় স্পর্শ করিবে? আজ জ্যোৎস্নার স্রোতে পৃথিবীর পাপ বিধৌত, মলিনতা সুদূরীকৃত। সেই স্রোতে বাণচাল হইয়া পাপীর হৃদয়ও আকাশপানে চাহিতেছে। আজ অপূর্ণ জগতে পূর্ণিমার পূর্ণতা! পৃথিবীতে স্বর্গের ছায়া!

আজ এই পূর্ণিমায় ভাগীরথীর তীরে নির্জ্জনে একাকী অমূল্যকুমার করতলন্যস্ত কপোলে বসিয়া আছেন। জ্যোৎস্না তাঁহার সম্মুখে খেলা করিতেছিল, প্রকৃতি তাঁহার চারিদিকে কবিতা ছড়াইতেছিল। অমূল্যকুমারের হৃদয় এখনও এত নীরস হয় নাই যে, নগ্ন-প্রকৃতির এই জ্যোৎস্নাময় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয় না। তাই আজ কবিতাকে লইয়া, জ্যোৎস্নার স্রোতে ভাসমান হইয়া, তাঁহার মন অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। আজ অমূল্যকুমার উপস্থিত হইয়াছিলেন—সেই অতীত-প্রদেশে ;—যেখানে বিগত জীবনের ঘটনাবলীর রেখা স্মৃতির স্বচ্ছসলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া খেলা করিতেছিল। অমূল্যকুমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলেন, এমনি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তাঁহার বিবাহ, এমনি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর উৎসঙ্গে তাঁহার ফুলশয্যা। অমূল্যকুমার দেখিতেছিলেন, জ্যোৎস্না-সিক্ত হাসি অধরে লইয়া আপাদমস্তক পুষ্পাভরণে বিভূষিতা, প্রকৃতির অতুল্যকুসুম লীলা মন্থর-গতিতে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, জ্যোৎস্নায় ফুলে মাখামাখি ; চারিদিকে ফুলের রাশি। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর গোলাপ তুলিয়া অমূল্যকুমার লীলার গায়ে ফেলিয়া দিলেন। লীলা ফিরিয়া দেখিল। অমূল্যকুমার কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মাথার উপর দিগন্ত কাঁপাইয়া কোকিল ডাকিল,—'কুহু।' বনস্পতির বিশাল শাখায় প্রতিহত হইয়া, প্রতিধ্বনি বলিল,—'কুহু।' কুঞ্জে কুঞ্জে সঞ্চরমান সমীরণ উত্তর দিল,—'কুহু।' ভাগীরথীর অপর পার, সে পঞ্চম ফিরাইয়া দিল, বলিল,—'কুহু।' অমূল্য-কুমারের মনে সে 'কুহু' বড়ই গোলমাল আরম্ভ করিল।

অমূল্যকুমার আপনা-আপনি অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "লীলা—লীলা! কোথায় তুমি? এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, এ অনন্ত-সৌন্দর্য্যে তোমার সৌন্দর্য্য না মিশাইলে বুঝি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হয় না; কিন্তু আজ কে তোমায় দেখাইয়া দিবে?" রূপে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত অমূল্যকুমার যে জন্য লীলার উপর রাগ করিয়াছিলেন, ভুলিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "আমি দেখাইয়া দিব।"

অমূল্যকুমারের চমক ভাঙ্গিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মনুষ্যমূর্ত্তি; জ্যোৎস্নালোকে চিনিলেন, নীরদা।

তখন অমূল্যকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা! তুমি এখানে কেন?"

বিনয়ে, নম্রভাবে নীরদা উত্তর দিল, "আপনি এখানে কি জন্য?"

তখনও প্রকৃতি বুঝি অমূল্যকুমারের সম্মুখে কবিতা ছড়াইতেছিল, তাই অমূল্যকুমার বলিলেন, "আমি আজ জীবনের পথে দিশাহারা; তাই আজ এখানে দিক্ নির্ণয় করিতে আসিয়াছি।"

ঠিক তেমনি স্বরে নীরদা উত্তর দিল, "আমিও আপনাকে দিক্ দেখাইতে আসিয়াছি।"

মর্ম্মপীড়িত স্বরে অমূল্যকুমার বলিলেন, "না নীরদা! সে ক্ষমতা আর তোমার নাই। আর একদিন এমনি করিয়া আমার লীলাকে দেখাইয়া জীবনের দিক্ দেখাইতে আসিয়াছিলে। তখন পৃথিবী প্রাতঃসূর্য্যকিরণ-মণ্ডিত ছিল,

যেদিকে চাহিতাম, সেই দিকেই সোণা; মাটিতে, গাছেতে সোণা ফলিত; লীলার নামে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত; লীলার রূপে চক্ষে স্থির সৌদামিনী দীপ্তিমতী হইত। ভাবিতাম, পৃথিবী লীলার জন্য, আমার জন্য,—পুণ্যভূমি, সুখের ক্রীড়াক্ষেত্র পৃথিবী!—তাই সে দিন তোমার সঙ্গে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিন অবধি কে আমার চোখের চস্‌মা খুলিয়া লইয়াছে। এখন শুধু দেখিতে পাই,—মানুষের ক্ষুদ্রত্ব; শুনিতে পাই,—শুধু পার্থিব গণ্ডগোল। সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ অবিশ্বাস; তবুও এখনও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না, লীলা অবিশ্বাসিনী।"

এতক্ষণ নীরদা সব বুঝিতে পারে নাই, তাই চুপ করিয়াছিল। 'লীলা অবিশ্বাসিনী' শুনিয়া পদ-দলিত গর্ব্বিত ভুজঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল, "লীলা অবিশ্বাসিনী নহে, আপনি তাহার কাছে অপরাধী।"

"যদি তাই হয়, যদি অমূল্যকুমার এতদিন না বুঝিতে পারিয়া থাকে, সে ত এতদিন তাহাদের মনের সন্দেহ কাহাকেও বলে নাই; হয় ত বলিলে এতদিন কেহ না কেহ তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিত। আর সে যে সেই সন্দেহের জন্য অনর্থক লীলাকে রূঢ় কথা লিখিয়াছিল, আর সেই জন্য লীলা কত কাঁদিয়াছে! আমি আজ লীলার কাছে কত অপরাধী"—মনে মনে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অমূল্যকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই যদি হয়, তবে বল, কেন সেদিন লীলা নীলরতনের মঙ্গলকামনা করিয়াছিল?"

তেমনি গর্ব্বিতস্বরে নীরদা বলিল, "লীলা নীলরতনের মঙ্গলকামনা করে নাই, হৈমবতীর মঙ্গলকামনা করিয়াছিল। লীলা হৈমবতীর কাছে কত ঋণী, আপনি কি বুঝিবেন? হৈমবতী লীলাকে বাঁচাইয়াছেন;—তাহার অধিক—লীলার ধর্ম্মকে বাঁচাইয়াছেন! এ অবস্থায় লীলার ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞ হৃদয় কেন না হৈমবতীর মঙ্গল-কামনা করিবে? তার পর হৈমবতী কি? হৈমবতী কি নীলরতন ছাড়া? আপনি স্বার্থপূর্ণ নয়নে এ সব দেখিতে পান নাই। লীলা তাহার কাজ করিয়াছে, আর আপনি বুদ্ধিমান পুরুষ, আপনি লীলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন!" যে গর্ব্বিতস্বরে নীরদা আজ অমূল্যকুমারকে এ সব কথা শুনাইতেছিল, অন্য দিন হইলে হয় ত সে অমূল্যকুমারের নিকট হইতে হাতে হাতে অবশ্যই কিছু ফিরিয়া পাইত;—কিন্তু আজ স্থিরভাবে অমূল্যকুমার নীরদার কথা শুনিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে অমূল্যকুমারের চক্ষের সম্মুখ হইতে কোয়াসা সরিয়া যাইতে লাগিল, আবার সেই কোয়াসা ভেদ করিয়া, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল,—রূপময়ী মহিমান্বিতা গৌরবান্বিতা লীলা। অমূল্যকুমার দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন, তিনি অপরাধী।

অমূল্যকুমার আপন মনের আবেগে নীরদার হাত ধরিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনের বেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "নীরদা! এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? লীলা কি ক্ষমা করিবে?"

নীরদা সময় পাইয়াছে, ছাড়িবে কেন? বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত আছে বৈ কি? এ প্রায়শ্চিত্তে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়, আর নীরদাকে ২২ কাহন কড়ি দিতে হয়। তা আমায় না হয় ২২ কাহন কড়ি নাই দিলেন, পায়ে ধরাটা অভ্যাস আছে কি? সেটা না হইলে কিন্তু চলিবে না।"

অমূল্যকুমার বলিলেন, "তা হবে এখন; এখন লীলাকে দেখাইয়া দিবে বলিয়াছিলে, চল।"

বিনাবাক্যব্যয়ে নীরদা আগে আগে চলিল, অমূল্যকুমার পাছে পাছে চলিলেন।

হেমন্তকুমারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ঠাকুরমার ঘরের কাছে গিয়া নীরদা আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকুর-মা!" ঠাকুর-মা সবে মাত্র দোক্তা-দেওয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘুমাইয়াছেন, দোক্তার ঝোঁকে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, লীলার ঘরে মস্ত একটা সিঁদেল চোর ঢুকিয়াছে। চোর চুরি করিবার আগে লীলার জিনিস পত্র সব গুছাইয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইতেছে। তখনি নীরদার ডাকে ঠাকুর-মার ঘুম ভাঙ্গিলে ঠাকুর-মা স্বপ্নের ঘোরে বলিলেন, "লীলা! ও যে চোর।"

নীরদা বলিল, "তা চোর বই কি! নহিলে এত রাত্রে এমন করিয়া আসিবে কেন? এখন দরজা খুলিয়া দিন।"

ঠাকুর-মা পাশ ফিরিয়া আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া শুইলেন, তার পর আবার নীরদার ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দরজা খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে অমূল্যকুমারকে দেখিয়াই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এস—দাদা এস!" ঠাকুর-মা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়াছিলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; তখন নীরদা তাঁহাকে কথা কহিতে অবসর না দিয়াই বলিল, "অমূল্যকুমারের লীলার কাছে কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখনি চলিয়া যাইতে হইবে; আর কাহাকেও জাগাইবেন না।" অমূল্যকুমারও আর কাহাকেও জাগাইতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা ঠাকুর-মা অনেক দিনের পর নাত-জামাইকে পাইয়াও অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না।

তখন নীরদা অমূল্যকুমারকে লইয়া লীলার ঘরে প্রবেশ করিল। অভাগিনী তখনও ঘুমায় নাই; আপনার অবস্থা ভাবিয়া অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইতেছিল। হঠাৎ নীরদা ও অমূল্যকুমারকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল; বসিয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তখন নীরদা লীলাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যেখানে উন্মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া খেলা করিতেছিল, সেইখানে বসাইল। তার পর অবগুণ্ঠন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, সোহাগে চিবুক ধরিয়া তুলিয়া, অমূল্যকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, এ মুখে অবিশ্বাসের ছায়া পান কি না? দেখুন দেখি, পৃথিবীর অবিশ্বাস এ মুখ স্পর্শ করিতে পারে কি না?"

নীরদার অনেক দিনের আশা পূরিল।

তখন সেই শুভ্ররশ্মি-পরিমণ্ডিত অশ্রুসিক্ত শিশির-নিষিক্ত ফুল্ল-কমলবৎ গৌরবময় মুখে অমূল্যকুমার অবিশ্বাসের ছায়া কিছুমাত্রও দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মন আবার পূর্ব্বের মত রূপসাগরে ডুবিল। অমূল্যকুমার ধীরে ধীরে

অগ্রসর হইয়া লীলার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "লীলা! আমি অপরাধী; বুঝিতে পারি নাই, না বুঝিয়া তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি।"

লীলার মুখে কথা ফুটিল না, ঘুরিয়া সেই অভিমান-প্রদীপ্ত অনন্যমেয় সৌন্দর্য্যময় মুখ অমূল্যকুমারের পায়ে পড়িল। সেখানে লুকাইয়া অশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লীলার মনের কথা।

লীলা চক্ষের জল মুছিয়াছে, এখন তাহার বালিকাস্বভাব ঘুচিয়াছে। লীলার হাসি এখন আর তেমন তরঙ্গায়িত নহে, চঞ্চল দৃষ্টি আর তেমন নির্ভয় নহে। লীলা যেন প্রতি পাদক্ষেপে ত্রস্ত, যেন প্রতি কার্য্যে সন্দিহান। লীলার স্বভাবে কি যেন একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে সরল, নির্ভয়, বিশ্বস্ত, আমি-পৃথিবীর-নই-ভাবটুকু আর যেন লীলায় দেখিতে পাই না। সে যেন প্রতি কার্য্যে আশ্রয় চায়, প্রতি কথায় যেন কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে। এখন তাহার হৃদয়ের আকুল রোদন, প্রাণের গভীর বেদনা কেবল একজনের পায়ে পৌঁছিতে পারিলেই হয়। সে একজন—জগতে স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, মুক্তি, আশা, ভরসা—বিপদে সম্পদ্, সম্পদে সুখ, সুখে আশা, আশায় সুফল, জীবনের একমাত্র সহায়—স্বামী অমূল্যকুমার। লীলা ইহার অধিক আর কিছু চায় না, ইহার অধিক আর কিছু বোঝে না।

পাড়ার লোকেরা কিন্তু বুঝিত অন্যরূপ। লীলার শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার সময় হইতেছে দেখিয়া ইদানী তাহারা লীলাকে নানারূপ বুঝাইতে, পড়াইতে, উপদেশ দিতে আসিত। কেমন করিয়া স্বামীকে ভেড়া বানাইতে হয়, কেমন করিয়া পাঁচখানা গহনা করিতে হয়, কেমন করিয়া একান্নবর্ত্তী সোণার সংসারে আগুন দিতে হয়,—এই সব বিষয়ক মূলমন্ত্র শিখাইতে তাহাদের বড়ই যত্ন ছিল। ঠাকুরমা তাহাদের পক্ষ-সমর্থন করিতেন, নীরদাও বাদ যাইত না। বিশেষ যে রাত্রে অমূল্যকুমার নীরদার সঙ্গে হেমন্তকুমারের বাড়ী আসে, সে রাত্রের ঘটনাটী নীরদার বড়ই গায়ে লাগিয়াছিল। স্বামী অপরাধ করিবে আর স্ত্রী তাহার পায়ে ধরিবে,—এটা কোন্ শাস্ত্রে লেখে, নীরদা তাহা বুঝিতে পারিত না। এতদিন হৈমবতীর কাছে থাকিয়াও নীরদার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে হৈমবতীর মুখ ঝাপ্টায় সে বড় ভয় করিত; তাই মুখ ফুটিয়া কোন বিষয় তাহাকে বড় মানা করিতে সাহস করিত না। আজ কিন্তু মুকুয্যের কি-একটা কথা লইয়া নীরদা আবার লীলাদের বাড়ী আসিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা উপদেশের কথা, দু-একটা জ্ঞানের কথা লীলাকে শিখাইয়া যাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে।

তাই এ-কথা সে-কথা—পাঁচ কথার পর নীরদা লীলাকে বলিল,—"বলি, সে রাত্রের কথা মনে কর দেখি?"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ রাত্রের কথা বলিতেছ?"

নীরদা বলিল,—"কেন, যে রাত্রে অমূল্যকুমার আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল।"

লীলার মুখ শুকাইল। আবার সে রাত্রে বুঝি লীলা কোন অপরাধ করিয়াছে; আবার বুঝি অমূল্যকুমার তাহাকে পায়ে ঠেলিলেন। লীলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনিমেষ-নয়নে নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন নীরদা বুঝাইয়া বলিল,—"বলি, এখনও বুঝিতে পার নাই? সে রাত্রে অমন করিয়া অপরাধী-অমূল্যকুমারের পায়ে পড়িতে গিয়াছিলে কেন?" নীরদার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, লীলা অমূল্যকুমারকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দেয়; আর নীরদাও সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-চার কথা বলে। কিন্তু তাহা না হইয়া উল্টা-শ্রী হইল। কোথায় অমূল্যকুমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, না—কোথায় লীলার মস্তক তাহার পায়ে লুটাইল!

লীলা মুখ তুলিয়া বলিল,—কাহার অপরাধের কথা বলিতেছ নীরদা? অপরাধের ছায়াও যে তাঁহাতে স্পর্শ করিতে পারে না! যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল আমার দোষে,—আমি সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই বলিয়া। আমার বড় সৌভাগ্য যে, তিনি দয়া করিয়া আবার দাসীকে পায়ে স্থান দিয়াছেন।"

নীরদা দেখিল, লীলাও হৈমবতীর ছাঁচে ঢালা;—তেমন খেলওয়াড় স্ত্রীলোক নহে। তবে এখনও ছেলে মানুষ, সময় থাকিতে থাকিতে বুঝাইলে এখনও হয়ত বুঝিতে পারিবে; তাই নীরদা বলিল,—"বলি আমরা ত মুখ্খু সুখ্খু মানুষ, অত-শত বুঝি না;—তবে বুঝি যে, এই সংসার একটা হিসারের মারপেঁচ বৈ আর কিছু নয়! নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইতে না

পারিলে চলিবে না। আর অমন করিয়া কথায় কথায় পায়ে পড়িলে ঠকিতে হইবে! অভিমান চাই, আব্দার চাই, চোখের জল চাই, মুখ ফিরান চাই!—যে স্ত্রী স্বামীকে কথায় কথায় উঠ-ব'স করাইতে না পারিল, নাকে দড়ি দিয়া, চোখে ঠুলি দিয়া ঘুরাইতে না পারিল, তাহার আর 'জারি' কোথায় রহিল? তাহার গায়ে পাঁচখানা গহনাই বা হইবে কিরূপে? সমাজে প্রতিষ্ঠাই বা হইবে কিরূপে? আর সে, সংসারের খেলায় জিতিবেই বা কিরূপে? তাই বলি, যদি নিজের ভাল চাও ত, বুঝিয়া চলিতে হইবে, অমন করিয়া পায়ে পড়িলে চলিবে না!"

নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া, সেই ডাগর-ডাগর পটোল-চেরা চোখ দুটি একটু বিস্ফারিত করিয়া লীলা বলিল,—"না নীরদা! আমি গহনা চাহি না, খেলার হার-জিত বুঝি না, তাঁহার পায়ে স্থান পাইলেই এ অভাগিনীর আশার শেষ, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। তাঁহার কার্য্য তিনি বুঝিবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার বা দেখাইবার কে? তাঁহাকে সুখী দেখিতে পাইলে আর আমি কিছু চাই না, তাঁহার মুখের হাসি ছাড়া আর আমি কিছু খুঁজি না। স্ত্রীলোকের ইহার বাড়া পৃথিবীতে আর কি সুখ আছে নীরদা?—ইহার অধিক আমি আর কিছু জানি না,—আর কিছু চাই না। নাই পাইলাম দুখানা গহনা—নাই জিতিলাম সংসারের খেলায়! কি বলিব নীরদা!—কত কাঁদিয়াছিলাম, যেদিন বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন! আর আজ কি বুঝাইব, কত সৌভাগ্যবতী আমি,—তিনি দাসীকে শুধু পায়ে স্থান দেন নাই, আদর করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন!"

হরি হরি! কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইল! নীরদা বলিল,—"হইয়াছে! থাম ঠাকৃরুণ! আমি তোমার কাছে মহাভারত শুনিতে আসি নাই! এমন জানিলে আসিবার সময় না-হয় দুটো ফুল হাতে করিয়া আসিতাম।"

লীলা বলিল,—"না নীরদা! এ মহাভারত নয়। আমি মিথ্যা বলি নাই। যেদিন নিরপরাধ হইয়াও, আমার সংসারে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, সেই দিন তাঁর চরণ ধ্যান করিয়াই বাঁচিয়াছিলাম। আর তাঁর চরণে আমার ভক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি আমার এ বিপদ্ কাটিয়াছে! নীরদা! তোমারও একদিন স্বামী ছিল; বল দেখি, আমাপেক্ষা শতগুণ অধিক তাঁহাকে ভক্তি করিতে কি না?"

নীরদা কথার-কাটাকাটি যাহাই করুক না কেন, সেও যে স্বামীকে ভক্তি করিত, এ কথা ঠিক। আজ অনেক দিনের পর সেই পুরাণো কথা জাগাইয়া লীলা নীরদাকে আপনার গায় হাত দিয়া বলিতে বলিয়াছে, তাই নীরদার চক্ষে জল দেখা দিল। তাই নীরদা বুঝিল, লীলা মিথ্যা কথা বলে নাই। তাই নীরদার চক্ষে জল দেখিয়া নিজের চক্ষের জল তাহাতে মিশাইয়া লীলা বুঝিল যে, সে জিতিয়াছে। এ সংসারে যে রমণী, রমণীর মুখে স্বামীভক্তির কথা শুনিয়া স্বামী কি বস্তু, তাহা না বুঝিল, তার স্ত্রীজন্মই বৃথা!

লীলা জিতিল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিল, নীরদাকে অতীতের স্মৃতি মনে করিয়া দিয়া ভাল করে নাই। তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া নীরদার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

চক্ষের জল মুছিয়া নীরদা বলিল,—"জাতে উঠিবার আয়োজন যত শীঘ্র হয়, তত ভাল। কিন্তু যেদিন হইতে হৈমবতী, মুকুয্যের কাছে, সকলের সমক্ষে সব কথা বলিবেন স্বীকার করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তিনি কেমন হইয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্বামী অদৃশ্য হওয়ায় তিনি শীর্ণ হইতেছিলেন; কিন্তু এখন যেরূপ হইয়া যাইতেছেন, তাহাতে যে আর বেশী কাল বাঁচিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মাঘমেলা প্রায় উপস্থিত। আবার রায়পুরে গোবিন্দ ঘোষের বাটীতে বারুণীর দিন মুকুয্যে জাতে উঠিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ও তোমার বাপের মত জানিতে পাঠাইয়াছেন। তোমার বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার অমত নাই। এখন আমি যাই, আর বেলা নাই।"

নীরদা উঠিল, কিন্তু হৈমবতীর অবস্থা শুনিয়া লীলার মনে বড় আঘাত লাগিল।

বাস্তবিক মুকুয্যে হৈমবতীকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছিলেন। যে হৈমবতী একদিন বাপের বাড়ীতে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, আজ সেই হৈমবতীকে সকলের সাক্ষাতে স্বামীর গুণাগুণ বর্ণন করিতে হইবে। হায়! ইহা অপেক্ষা যে সাধ্বী হৈমবতীর মৃত্যু ছিল ভাল।

তিনিও তাই ভাবিতেছেন,—"হায়! আমি মরিলাম না কেন? কোন্ মুখে, কেমন করিয়া স্বামী-নিন্দা করিব? যাঁর বিষণ্ণ-মুখ দেখিলে আমি ব্যথা পাই, যাঁর একটী দীর্ঘশ্বাসে আমি দশদিক অন্ধকার দেখি, যাঁর চক্ষে জল পড়িলে আমার

বুকে শেল বাজে,—হায়! কেমন করিয়া আমি দশের কাছে সেই স্বামীর মাথা হেঁট করাইব?—আবার এদিকে একটী নির্দ্দোষ বালিকা,—সংসারের আবিলতা যাহাকে স্পর্শ করিতে পার নাই,—সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কোন্ প্রাণে বা সেই সরলা সাধ্বীর সর্ব্বনাশ সাধন করি? সত্য বলিলে, স্বামীর মাথা হেঁট, আবার সত্যের অপলাপ করিলে লীলার সর্ব্বনাশ;—হায়! আমি মরিলাম না কেন? মা জগজ্জননি! তোর দুঃখিনী মেয়েকে কোলে নে মা!"

হৈমবতীর বুকের ভিতর দারুণ দাবানল জ্বলিতেছিল। হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। ন্যায় ও সত্যের এবং প্রেম ও পতি-ভক্তির অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে, সাধ্বী প্রতি-মুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ্ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মুকুয্যে কিন্তু আয়োজনের ক্রটি করেন নাই। আগামী মাঘ মেলায় জাতে উঠিবার দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বোধন।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার রায়-পুরে বারুণীর মেলা বসিয়াছে। আবার তেমনি জিনিস-পত্রের আমদানি। আবার তেমনি লোকজনের সমাগম। কাপড়ে কাপড়ে গাঁট বাঁধিয়া, হাতে হাতে ধরাধরি করিয়া "ও নটো! কোথা গেলি রে." "ও হ'রের-মা! এইদিকে"-রবে চারিদিক্ ধ্বনিত করিয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর মত মানুষের পাল চলিয়াছে। উদ্দেশ্য,—মেলা দেখা, ধুচুনি-চুবড়ি কেনা, আর তেলেভাজা বেগুনি-ফুলুরির শ্রাদ্ধ করা। তার পর গঙ্গাস্নানটা বাড়ার ভাগ। কয় মাগী অন্ধ, নাতিনীদের হাত ধরিয়া নিতান্তই ষোল-আনা পুণ্য-স্নান করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু হইলে কি হয়, চক্ষুরত্নে বঞ্চিত বলিয়া মেলা দেখা হইল না,—এ দুঃখ আর তাহাদের রাখিবার স্থান ছিল না।

আবার মণিহারী দোকানগুলার কাছে তেমনি ভিড়। দোকানদারেরা খরিদ্দার থামাইতে অবসর পাইতেছে না।

এ উহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া যাইতেছে,—কাহারও দৃক্‌পাত নাই। তবে যুবতীরা, কোথাও ষণ্ডা-পুরুষগুলোর নিকট হইতে চকিতের ন্যায় সরিয়া অন্য গুরুজনের পাশে দাঁড়াইতেছে, কোথাও বা "পোড়ার-মুখো মিন্সের রকম দেখ!" "অধঃপাতে যাও" বলিয়া পার্শ্বের পুরুষদের কল্যাণকামনা করিতেছে! মেলায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ। ক'নে-বৌ ঘোম্‌টা খুলিয়াছে, তরুণীর মুখ ফুটিয়াছে, যুবতী কোলের ছেলে নামাইয়া জিনিস পত্রের দর করিতেছে। প্রৌঢ়া, দরে বনে নাই বলিয়া দোকানদারের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অদূরে নব্যবাবু চোখে আইগ্লাস লাগাইয়াছেন,—কাঁটাবনে পদ্মফুল খুঁজিবার জন্য! ভ্রাতা চোখে চসমা লাগাইয়াছেন,—মেলায় স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়া জাতীয় স্ত্রীচরিত্রের বিকাশ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য! আর গলদঘর্ম্ম হইয়া মিসনরি মহাশয় তে-মাথার মোড়ে কাঠের টুলে দাঁড়াইয়া গলা ফাটাইতেছেন,—কুলি-মজুর জড় করিবার জন্য!

রায়পুরের আজ ঘরে ঘরে আনন্দোচ্ছ্বাস! যে সংবৎসর ঘরে আসে নাই, সে আজ ঘরে আসিয়া স্ত্রীপুত্রকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিতেছে। এ বাড়ী নূতন-জামাই আসিয়াছে; ও-বাড়ী নববধূ আসিয়াছে; পাশের বাড়ী শ্বশুরঘর হইতে কন্যা আসিয়াছে;—প্রতিঘরেই আনন্দ কোলাহল। এখানে জামাই-ঠকানর সূচনা হইতেছে; সেখানে কুটুম্ব-ভোজনের আয়োজন হইতেছে; ওখানে হাসির স্রোতে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে; আজ রায়পুর দেখিয়া মনে হয়, বুঝি সুখ-

মারুত-হিল্লোলে পৃথিবীর কান্নাহাটি রায়পুর হইতে উঠিয়া গিয়াছে! বুঝি রায়পুরে নিত্যই ষষ্ঠী সপ্তমী; আর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিবে না।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা আনন্দোচ্ছ্বাস হইতেছিল, গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী। গৃহদ্বার সুন্দর কদলীশাখায়, আম্র-পল্লবে, পূর্ণকুম্ভে শোভমান। উপরে মধুর নহবৎ বসিয়াছে। অগণিত লোকজনের সমাগম। ফাই-ফরমাস খাটিতে খাটিতে সনাতনের পায়ের জুতা হিঁড়িয়া যাইতেছিল। গলায়-পৈতা, হুঁকা-হাতে মুকুয্যে বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আনাগোনা করিতেছিলেন। টাকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়া, পাশের ঝুলন্ত কোঁকড়ান চুলগুলি আঁচড়াইয়া পাকা আমের মত মুখে মধুর হাসি হাসিয়া গোবিন্দ ঘোষ সকলকে আপ্যায়িত করিতে-ছিলেন। বড় বড় মোড়লেরা ঢাবা-হুঁকো অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ছোট ছোট গাঁয়ে-না-মানে-আপনি-মোড়লেরা কলিকাতাতেই কাজ সারিতেছিলেন, আর সরফরাজি করিয়া বলিতেছিলেন, বুঝি তাঁহারা অনুগ্রহ না করিলে হেমন্ত-কুমার জাতে-ঠেলা হইয়া মরিত! গোবিন্দ ঘোষ সকলকে যথাযোগ্য বিনীত সম্ভাষণ করিতেছেন। ওদিকে স্তূপাকার দানের জিনিস সাজানো;—অসংখ্য ঘড়া, ঘড়ার উপর থাল, থালের উপর কাপড়, কাপড়ের উপর ষোল টাকা করিয়া সাজানো। আগন্তুকদের শুধু দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না; কতক্ষণে করতলগত হয়, তাই ভাবিতেছেন! এরি মধ্যে হেমন্তকুমারের ও অমূল্যকুমারের নামে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গিয়াছিল। অভ্যাগতেরা বলিতেছিলেন,—"হবে না

কেন? কত বড় ঘর! গাঁয়ের ভিতর উঁদের না-খেয়ে-মানুষ কে?”

এরি মধ্যে সপত্নীক হেমন্তকুমার, লীলা ও হেমন্তকুমারের মাতা আসিয়াছেন। অমূল্যকুমার, তাঁহার পিতা ও তাঁহাদের বাড়ীর আর আর সকলের আসিতেও বাকি নাই। নিমন্ত্রিতেরা অনেক আগেই আসিয়াছেন, কেবল হৈমবতী এ পর্য্যন্ত আসেন নাই। সকলেই উৎসুক-চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় দূর হইতে বেহারার আওয়াজ শোনা গেল। তখনই একজন পাইক আসিয়া সংবাদ দিল,—“হৈমবতী আসিতেছেন।” দেখিতে দেখিতে পাল্কি ঘরের ভিতর ঢুকিল। গোবিন্দ ঘোষের গৃহিণী সসম্ভ্রমে হৈমবতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। হৈমবতীর শুধু একখানি রাঙ্গাপেড়ে-সাড়ী-পরা, হাতে নোয়া ও মাথায় সিঁদুর, গায়ে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই। তবুও তিনি উজ্জ্বল সধবার চিহ্নে দীপ্যমানা। হৈমবতী নামিয়াই লীলাকে কোলের কাছে লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। লীলাও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, চকিত হইয়া আপনার চোখের জল উপহার দিল। লীলা হৈমবতীর রোগের সময়ও তাঁহার এমন শীর্ণ বিবর্ণ মুখ দেখে নাই।

সকলে সমবেত হইলে মুকুয্যে প্রস্তাব করিলেন, “আগামী কল্য বারুণী; শুভদিনে পুণ্যস্নানের পর হেমন্তকুমারের জাতে-উঠা হইবে।” এ প্রস্তাবে কাহারও বড় একটা অমত ছিল না, তবে আগন্তুকদের মধ্যে “হাত-ধোয়ার” দল কাণাকাণি করিতেছিলেন,—“এত লোকজনের

মধ্যে এত ঘর-জোড়া করিয়া কলসী, থাল, কাপড়, টাকা রাখিবার দরকার? ও-গুলার আগেই বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই হয়।”

দেখিতে দেখিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল। উষার কোলে মাথা দিয়া বিহঙ্গমকুলের প্রভাতীসঙ্গীত উপহার লইয়া মৃদু-মধুর পবন-হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলোকচ্ছটা জগতে দেখা দিল। সেই আলোকচ্ছটা দেখা দিতেই গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর সমবেত কুলবধূরা তাহাকে মঙ্গলবাদ্যের সঙ্গে বরণ করিল। কাল শেষ-রাত্রে তাহারা শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় বীতনিদ্র ছিল, আজ উষার হাসি দেখিবার পূর্ব্বেই শুভদিনকে জগতে সম্ভাষণ করিয়া আনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। শুভদিনের প্রথম পদক্ষেপেই গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল, মঙ্গলধ্বনি! তার পর কথার স্রোত, পরিহাসের স্রোত, হাসির স্রোত শতধারে বহিয়া চলিয়াছে। সে স্রোতের তরঙ্গ, সে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত যে দেখিল না, সে বুঝিল না; যে দেখিয়াও বুঝিল না, সে কিছুতেই বুঝিবে না।

কিন্তু সে উৎসবের মধ্যে কেবল হৈমবতীর মুখ দেখা গেল না। ইহার কারণ জানিবার জন্য কেহ কেহ উৎসুক হইল। লীলাও হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, আকুল-প্রাণে তাঁহাকে অন্বেষণ করিল। কাল বৈকালে ঠাকুর-মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আর লীলাকে শুভআশীর্ব্বাদ করিবার জন্য একবারমাত্র তিনি সমবেত জন-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু শুভ-আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ই তাঁহার মুখখানি কাঁদ-কাঁদ দেখিয়া লীলা ভীত হইয়াছিল। পাছে তাঁহার সেই মলিন-

মুখ আনন্দের স্রোত অবরোধ করে, এই ভাবিয়া তখনই তিনি অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

গৃহের এক কোণে নির্জ্জনে অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইয়া হৈমবতী ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া তিনি স্বামীকে দশের সাক্ষাতে অপরাধী বলিবেন! এ চিন্তায় সতী, সকাতরে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন,—"দয়াময়! এ দায় হইতে উদ্ধার কর!" পতিব্রতার সেই মর্ম্মান্তিক রোদন ভগবানের চরণে স্থান পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে অভাগিনীর সকল দুঃখের শেষ হইয়া আসিল।

এদিকে আজ সকাল হইতেই আত্মীয় কুটুম্ব-পরিবৃত হইয়া, প্রবহমান সুখের স্রোতে গা-ঢালিয়া, নিজে সুখী হইয়া, অপরকে সুখী করিয়াও লীলা উৎসুকচিত্তে হৈমবতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন শেষে দেখিল যে, হৈমবতী আসিলেন না, না-আসার কারণ কি, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিতেছে না, তখন লীলা হৈমবতীর ঘরের দিকে চলিল। লীলাকে হৈমবতীর ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তাহার অনুসরণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ লীলা?"

লীলা উত্তর দিল,—"হৈমবতীর কাছে যাইব।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী লীলার হাত ধরিলেন; বলিলেন, "তা থাক্, এখন গিয়া কাজ নাই।" শেষে লীলার নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া বলিলেন,—"তবে শোন, একটা কথা বলি;—কাল অনেক রাত্রে তোমরা শুইবার পর কোথা হইতে এক ক্ষেপা সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। সে কখন গাহিতে-

ছিল, কখন কাঁদিতেছিল, কখন তোমার, কখন বা হৈমবতীরও নাম করিতেছিল। শেষে বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আসিলে, সনাতন তাহার পাকা বাঁশের লাঠির ঘা-কতক তাহার পিঠে দিয়াছিল। যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে, কি জানি কি ভাবিয়া হৈমবতী তাহাকে দেখিতে গেলেন। সেখানে গিয়া, সেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অনেক যত্নে একবার চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই নিদ্রিত হইলেন; সেই অবধি সমভাবেই আছেন। এইমাত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

বুদ্ধিমান্ পাঠককে বলিতে হইবে না যে, ঐ ক্ষেপা-সন্ন্যাসী হতভাগ্য নীলরতন রায়;—পাপিষ্ঠ পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার মন হইতে মোহ অপসারিত হয় নাই; নীলরতন তখনও লীলার রূপে আকৃষ্ট। অধিক কি, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত তাহার এই শেষ-সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য, এখনও যদি লীলা লাভের কোন উপায় থাকে! পাপিষ্ঠের আরও অভিপ্রায়,—লীলা যে নির্দ্দোষ, তাহার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক, এ কথাও যেন কিছুতে প্রকাশ না পায়!—অন্ততঃ, হৈমবতী তাহা নিজমুখে প্রকাশ না করেন! অহ! মূর্ত্তিমান্ নরক এইরূপই বটে! করুণাময়ী হৈমবতী স্বামীর এই ভীষণ পরিণাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

লীলা কিন্তু তবু শুনিল না। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া চলিল। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীও অগত্যা

চলিলেন। তার পর হৈমবতীর ঘরে গিয়া দেখেন, হৈমবতী তখনও অজ্ঞান, অচৈতন্য। কিন্তু সেই সংজ্ঞাহীন মূর্ত্তি শীর্ণ বিবর্ণ হইলেও মহামহিমময়ী। মুখে অনৈসর্গিক কিরণ-রেখা। মস্তকে সিন্দূর-বিন্দু দেদীপ্যমান,—উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর! হাতের লোহা যেন বহুমূল্য অলঙ্কারকেও গঞ্জনা দিয়া বিভাসিত হইতেছে। সে মূর্ত্তি যেন বহুদিনের পর কি-এক হারানিধি পাইয়া আপনার ভাবে আপনিই অঘোর হইয়া রহিয়াছে। হৈমবতীর সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াও লীলা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীও চক্ষের জল মুছিলেন। তার পর অনেক ডাকা-ডাকিতেও হৈমবতী চক্ষু খুলিলেন না। তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তাঁহার হাতে পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, হাত ও পা শীতল হইয়া আসিতেছে। ঘোষগৃহিণী শিহরিলেন, লীলা শিহরিল! সেই মুহূর্ত্তেই গোবিন্দ ঘোষের কাছে সংবাদ গেল; পরমুহূর্ত্তেই সেই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বড়ই আমোদ আহ্লাদ চলিতেছিল। হলুদ মাখিয়া, হলুদ মাখাইয়া ম্যাজেণ্টার-মেহদি-পাতার রঙ্গে আপাদ-মস্তক রঞ্জিত করিয়া রমণীগণ অপূর্ব্ব সাজে সাজিতেছিলেন। পুরুষদের মধ্যেও বড় কম হইতেছিল না। মুকুয্যে, সনাতনের পিঠ চাপড়াইতেছিলেন, তাহার তামাক দিতে দেরি হইতেছিল বলিয়া। সনাতন পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া তামাক দিয়া মুকুয্যের পায়ের ধূলা লইতেছিল। গোবিন্দ ঘোষের সেই স্বাভাবিক

প্রেমের উৎস শতধারায় ছুটিতেছিল। আনন্দে অধীর হইয়া তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে মধ্যে মুকুয্যের সঙ্গে গাঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইতেছিলেন, আর চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছিল। সমবেত লোকেরা খোসগল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল; ঢলিয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিল, আবার উঠিতেছিল, আবার হাসিতেছিল, আবার পড়িতেছিল! সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য!

হৈমবতীর পীড়ার সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র ধীরে ধীরে সেই উচ্ছ্বলিত আনন্দের স্রোত অবরুদ্ধ হইল। অভ্যাগতগণের মধ্যে হৈমবতীর পীড়া সম্বন্ধে, সন্ন্যাসী-সম্বন্ধে নানারূপ গুরুতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল, লীলার অদৃষ্টে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণ হঠাৎ গাঢ়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

গোবিন্দ ঘোষ হৈমবতীর ঘরের দিকে দৌড়িলেন, মুকুয্যে পিছনে চলিলেন, সনাতনও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেখানে সকলে হৈমবতীর অবস্থা দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। জীবনের যে আশা নাই—একথা বুঝিতে আর কাহারও বাকি ছিল না। নীরদা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, লীলা গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

* * * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।
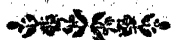
বিসর্জ্জন।

ধীরে,—লীলা! ধীরে! পৃথিবীর পথ বড় পিচ্ছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া চল! একবার স্খলিতপদ হইলে আর উঠিতে পারিবে না! চারিদিকে পাপের ছায়া! তুমি পাপ স্পর্শ না করিলেও পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে! তাই বলি, অমন অন্যমনা হইয়া চলিও না।

ওকি! কাঁদিতেছ কেন? আজ তোমার শেষ দিন, আজ তোমার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইবে;—এ জনমে স্বামী-সুখ পাইলে না বলিয়া কাঁদিতেছ? সমাজে তুমি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইতে পারিলে না বলিয়া, আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছ? হৈমবতী তোমার নির্ম্মল চরিত্রের কথা,—সতীত্ব-রত্নের কথা জগতে জানাইতে পারিলেন না বলিয়া মরিতে যাইতেছ? কলঙ্কিনী-নাম লইয়া তুমি জীবন-ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া আত্মঘাতিনী হইতে যাইতেছ,—না? কিন্তু কাঁদ কেন, লীলা! স্বামী অমূল্যকুমারের মুখ মনে

পড়িতেছে? তাই, মরিয়াও তুমি সুখী হইতে পারিবে না, ভাবিতেছ? কিন্তু কি করিবে, সকলই তোমার ভবিতব্য! তবে যাও সতী, সেই দিব্যধামে! যেখানে রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই, সতীত্বের কণ্টক নাই!—তবে যাও লীলা, সেই মহালোকে, যথায় নির্ব্বিঘ্নে পতিপদ-পূজা করিতে পাইবে, সরলতায় সুখের মন্দাকিনী বহিবে; অসুররূপী নীলরতন রায় যেখানে নাই,—যাও, আজ ত্রিদিবের হিরন্ময় দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত, যাও, আজ দিব্যাঙ্গনারা পুণ্যলোকে সতীর আগমনী চাহিতেছে।

আবার বলি, ধীরে লীলা! ধীরে! ও সুন্দর-মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দাও! আজিকার দিনে আর কাহাকেও দেখা দিও না। ঐ দেখ, শত শত চক্ষু একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিতেছে। তোমার ঐ শুভ্র নিষ্পাপহৃদয়ে কলঙ্কের কালিমা-রেখা স্পর্শ করিতে পারে না জানি, তবুও সতর্ক থাক! দেবতারা অমর, তবুও এই রূপের আগুনে পুড়িয়া মরেন। আর সংসারের জীব, মায়া-মোহে জড়িত, সেই মানুষ-পতঙ্গেরা এই রূপের আগুন দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকিবে? হায়! অভাগিনি! কেন এমন রূপ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে?

কৈ লীলা, শুনিলে না? এখনও অন্যমনা! তবে—তবে, এই যে সম্মুখে ভাগীরথী! আহা! কোটি কোটি জীবের, শত শত যুগের রাশি রাশি পাপ বিধৌত করিয়া কুলুকুলু-রবে মা চলিয়াছেন। এত পাপরাশি সংস্পর্শেও মা আমার স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সলিলা, সুপবিত্রা! মা! তুই অনন্ত কালের

সাক্ষী!—আজ মা তোর এই প্রশান্ত সুন্দর বক্ষে অভাগিনী লীলা তাহার দুঃখের বোঝা নামাইতে আসিয়াছে, দুঃখিনীর প্রতি সদয় হ' মা!

সাবধান লীলা! স্বামীর হাত ধরিয়া নামিও! দেখ, দেখ, তোমার দিকে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী অনিমেষ-নয়নে চাহিতেছে! ও কি! ধর, ধর! ঐ যে হাত দেখা যায়! ঐ যে এদিকে চুল ভাসিয়া উঠিয়াছে! এদিকে! ওদিকে! কৈ?—আর নাই। সব ফুরাইল! হায়, কি করিলে লীলা! আজিকার দিনে এ কি করিলে! এখনও যে প্রভাত-সূর্য্যের ক্ষীণজ্যোতি! এখনও যে দশদিক্ আলোকমালায় বিভূষিত হয় নাই! তবে অন্ধকার কেন? হায়! কে বলিবে?—ভগবন্! তুমিই জান, অন্ধকার কেন?

* * * *

লীলার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য ভাগীরথীর প্রশান্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যে মিশাইয়া গেল। অমূল্যকুমার জলে ঝাঁপ দিলেন, সনাতনও ঝাঁপ দিল।—জল তোলপাড় হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! কিছুতেই সে স্বর্ণ-প্রতিমা মিলল না। আজ পূর্ণিমায় পূর্ণ অমাবস্যা! প্রভাতগগনে সূর্য্যাস্ত! উদ্বোধনের পূর্ব্বেই বিজয়া করিয়া সকলে বিষণ্ণমনে ঘরে ফিরিল!

* * * *

এখনও হৈমবতীর নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। হায়! সে নিদ্রা কখনও ভাঙ্গিলও না! পতির পাশে সতী মরিয়া জুড়াইল! হৈমবতীর যথারীতি সৎকার করা হইল। সৎকারের সময় অর্দ্ধরাত্রে শ্মশানে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, দিক্‌দিগন্ত

প্রতিধ্বনিত করিয়া কে বিষাদ-স্বরে বেহাগে আলাপ করিতেছে ;—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥"

গায়কের সে স্বর বড় গম্ভীর, বড় করুণাপূর্ণ, সে স্বর বুকে বিদ্ধ হয়। নৈশ-সমীর কাঁপাইয়া, জল-স্থল-ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়ক আবার গাহিল ;—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং বিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।"

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥"

ধীরে ধীরে সেই স্বর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন সেই সপ্তস্বর-পূর্ণ মহাগীতিতে যেন ইহ-জগৎ পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে সেই স্বর অগ্রসর হইতে লাগিল। শবদাহ-কারিগণ সভয়ে—সবিস্ময়ে, চিতার অস্ফুট আলোকে চিনিল, সন্ন্যাসী—নীলরতন রায়।

হঠাৎ উন্মত্ত বিকট চীৎকারে শ্মশান প্রতিধ্বনিত হইল। সেই শ্মশানে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত দগ্ধ যষ্টি লইয়া সন্ন্যাসী সৎকারকারীদিগকে আক্রমণ করিল। যে যেখানে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। তার পর অর্দ্ধদগ্ধ হৈমবতীর শব কোলে করিয়া সন্ন্যাসী শ্মশানে বসিয়া রহিল !

* * * *

সহৃদয় পাঠক! লীলার অদৃষ্টসূত্র ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন। ইহার পর লীলার জন্য

ভবিষ্যতে কি আছে, যদি জানিতে ঔৎসুক্য থাকে, তবে আপনি একবার লীলার অন্বেষণ করিয়া দেখুন। আমাদের আর জানিবার ইচ্ছা নাই। অমূল্যকুমার প্রভৃতিকে দিয়া অনুসন্ধান করিয়াও লীলাকে পাই নাই। তবে আপনার অনুসন্ধানের ফল কি হইবে, জানি না। লীলায় অনুসন্ধানের ভার আপনার হস্তে দিয়া, তাহার ভবিষ্য-জীবনের ইতিহাস সংগ্রহের ভার আপনার উপর রাখিয়া, আমরা এখন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, যদি লীলাকে না বাঁচাইতে পারেন, তবেই সুখী হইব। জগতে যে আগে মরিতে পারিল, সেই সুখী।